সপ্তম অধ্যায়

সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ
(A Sociolinguistic analysis)

ভাষা হল মানব মনের ভাব প্রকাশের উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনি সমষ্টি। বস্তু সামাজিক উপযোগিতাই ভাষার অন্যতম স্রষ্টা। মানুষ সামাজিক জীব, তাই যে কোনো ভাষিকতত্ত্ব মাত্রই সমাজিক। ভাষার সঙ্গে সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষা ও সমাজের এই পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় ৪ হাজার ভাষাকে ১২টি ভাষাবংশে ভাগ করা যায়। আবার প্রত্যেকটি ভাষাবংশের রয়েছে একাধিক উপবিভাগ। এক একটি ভাষার মধ্যেও আবার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। তেমনি বাংলা ভাষার অঞ্চল ভেদে পাঁচটি আঞ্চলিক উপভাষা বর্তমান। অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার যেমন বৈচিত্র্য চোখে পড়ে তেমনি সমাজ ভেদেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মতো। বাঙালী সমাজ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত, শিশু-যুবক-মধ্যবয়স্ক-বৃদ্ধা, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান, শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ- বৈশ্য-শূদ্র, পুরোহিত-কামার-কুমোর-ছুতোর-বণিক-শ্রমিক-কৃষক-চাকুরিজীবী ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। অর্থাৎ সামাজিক অবস্থান, জাতি, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, পেশা, নৃগোষ্ঠী, ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষা, অভিরুচি, ট্যাবু, সংস্কৃতি, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন, পরিবেশ পরিস্থিতি ইত্যাদির তারতম্য ভেদেও বাংলা ভাষার পরিবর্তন তথা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্য বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষাতেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

১. জাতিভেদে ভাষা পরিবর্তন :[১]

উত্তর দিনাজপুর জেলার সমাজ মূলতঃ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত। অল্পবিস্তর খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এই জেলায় বসবাস করলেও তাদের ভাষার কোনো আলাদা পার্থক্য চোখে পড়ে না কারণ তাঁরা বেশীরভাগই সাঁওতালি ভাষায় কথা বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা দেশীয়, পলিয়া, কাপালী, নমঃশূদ্র ও ব্রাহ্মণ এই পাঁচটি জাতির উপস্থিতি লক্ষ্য

করতে পারি আর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গাল ও বাদিয়া এই দুটি জাতিকে লক্ষ্য করতে পারি, যাদের কথ্যভাষার এক আলদা স্বাতন্ত্রতা চোখে পড়বার মতো।

১.১. হিন্দু সম্প্রদায়

১.১.১ দেশীয়[২]

উত্তর দিনাজপুর জেলায় দেশীয় বলতে মূলতঃ রাজবংশী জাতিকে বোঝানো হয়। দেশীয় জাতির ভাষা হল কামরূপী।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য -

ক.	অ > আ	=	কথা > কাথা, মহারাজা > মাহারাজা
খ.	আ > অ	=	মাংস > মংশ, পান্তা > পন্তা
গ.	ই > এ	=	বিবাহিত > বেহাতি, জিভ > জেব্বা
ঘ.	এ > অ	=	এখন > অখন্, এমনি > অম্নি
ঙ.	ও > অ	=	কোদাল > কদাল, গোসাই > গসাই
চ.	ত > দ	=	বোতাম > বুদাম্, গীত >গীদ
ছ.	র > অ	=	রং > অং, রোসুন > অসুন
জ.	ব > ভ	=	ডোবা > ডোভা, চাবি > চাভি

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. অনুসর্গ

অনুসর্গ নির্দেশক শব্দগুলির মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃতজাত শব্দ পাওয়া যায়। যেমন— আগৎ (< অগ্র), পাছৎ (< পশ্চাৎ), সাথ (< সার্থ), পাকে (< পক্ষ) অর্থ - দিকে, লোগি (< লগ্ন) অর্থ - সঙ্গে, সহিত। কয়েকটি বিশিষ্ট অনুসর্গ হল—কহে (অর্থ -জন্য), তনে/তানে (অর্থ - জন্য) ইত্যাদি।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ নির্দেশক রূপে ব্যবহৃত ক্রিয়া বিভক্তিগুলি হল—ই, —এ, —বা, —অ্যা, —তে, —লে ইত্যাদি। যেমন— চলি (চলে), খায়ে (খেয়ে), আসবা/আসপা (আসতে), যাতে যাতে (যেতে যেতে) ইত্যাদি।

গ. সর্বনাম

দূরত্ব নির্দেশক সর্বনাম পদগুলি হল, একবচন—উ, উটা, ওটা, উখান্‌টা। বহুবচন—ঐলা, উলা, ঐগ্‌ল্যা। আর সমীপ্য নির্দেশক সর্বনাম পদগুলি হল, একবচন—ই, ইটা, ইডা, ইখান্‌টা। বহুবচন—ইলা/এইলা, এইগ্‌ল্যা।

ঘ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ

কিছু বিশিষ্ট ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—লুত্‌লুত্‌ (অর্ত - নরম), গুপগাপ (অর্থ - গোপনে), জ্যালজ্যাল (অর্থ - পাতলা), জ্যাবজ্যাব (অর্থ - ভেজা), ডিগ্‌ডিগ্‌ (অর্থ - বুক ফুলিয়ে), ভক্‌ভক্‌ (অর্থ -তাড়াতাড়ি) ইত্যাদি।

১.১.২ পলিয়া

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একটি জাতি হল পলিয়া। কামরূপী ভাষাই মূলতঃ এদের কথ্যভাষা হলেও স্বতন্ত্র ভাষা চোখে পড়ে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. অ > ও = লক্ষ > নোক্‌খো, সন্ধ্যা > সোন্‌ধা

খ. আ > ও = মাগী > মোগী, খাসি > খোসি

গ. উ > ঐ = পুকুর > পৈখোর, সুরঙ্গ > সৈরঙগে।

ঘ. এ > অ্যা = তৈল > ত্যাল, দেখ > দ্যাখ

ঙ. ও > উ = পোকা > পুকা, পোয়া > পুয়া

চ. ক > গ = সকল > সগল, শোক > শোগ

ছ. দ > ড = দেড় > ড্যার, দাড়কাক > ডারকাউয়্যা

জ. ল > ন = লজ্জা > নজ্জা, লাল > নাল

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. বচন

একবচন বোঝাতে ট, টা, ড, ডা, খান্‌ এবং বহুবচন বোঝাতে রা, খান্‌, গছা, মোটা, বহুৎলা ইত্যাদি শব্দ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন—চটখান (অর্থ - চটটি), এক গছা সুতা

(অর্থ - এক গোছা সূতো), মানশিগিলা (অর্থ - মানুষগুলো), বহুৎলা লোক (অর্থ - অনেকগুলো লোক) ইত্যাদি।

খ. কারক

কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকে 'ক্' বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—বাপক্ দ্যাও (বাবাকে দাও)। অপদান ও অধিকরণ কারকে তি, তে, ত্ বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন—উপরতে পড়িল্ ছুয়াট (উপর থেকে বাচ্চাটা পড়ে গেল)

গ. অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ নির্দেশক রূপে ব্যবহৃত ক্রিয়া বিভক্তিগুলি হল—আ, —ই, —ইয়ে, —এ, —ইবা, —য়া ইত্যাদি। যেমন—ডাকায়া (ডেকে), করবা (করতে), খাবা (খেতে) ইত্যাদি।

১.১.৩ কাপালি

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক.	অ > ঐ	=	বলদ > বৈল, হলুদ > হৈল্দ্যা
খ.	আ > উ	=	খাওয়া > খুয়া, দাওয়া > দুয়া
গ.	ই > অ্যা	=	ঢিল > ঢ্যাল, ছিনাল > ছ্যানাল
ঘ.	এ > ই	=	এবার > ইবার, মেঝে > মাঝিয়া
ঙ.	উ > ও	=	ঘুম > ঘোম, ওষুধ > ওশোদ
চ.	খ > হ	=	দেখা > দ্যাহা, এখন > অ্যাহন
ছ.	জ> চ	=	তেজপাতা > ত্যাচপাতা, সবুজ > শোবুচ
জ.	ধ > দ	=	বাঁধ > বান্দা, গন্ধ > গোন্দো
ঝ.	প > ফ	=	পেখম > ফ্যাকম্, পিড়ি > ফির‍্যা

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. বচন

বহুবচন নির্দেশক বিশিষ্ট বিভক্তিগুলি হল—ম্যালা, গুন্যা/গুইন্যা ইত্যাদি। যেমন—ম্যালাট্যাহা (অর্থ-অনেক টাকা), মানুষগুইন্যা (অর্থ - মানুষগুলো)।

খ. উপসর্গ

উপসর্গ প্রয়োগের বৈচিত্র্য ও নতুন নতুন শব্দ তৈরীর বিচিত্র দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। অ, অন, আ, কু, নি, বিনা, পাতি ইত্যাদি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দগুলি হল—অকাম, অনটাইম, আগুনা, বিনা পয়শা, নিলাজ ইত্যাদি।

গ. নামধাতু—

নামধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ডর + আই + ছে = ডরাইছে, হু + নাই + তাছে = হুনাতাছে, হাশ + তা + ছে = হাশতাছে, পড়া + ই + তাছে = পড়াইতাছে ইত্যাদি।

ঘ. কারক—

কর্তৃকারকে একবচনের বিভক্তিগুলি হল—শূন্য, য়, ডা, য়ে, এ, তি, র, রি এবং বহুবচনে—শূন্য, রা, গে, গো, গুলা প্রভৃতি। যেমন—গরুতি মাঠ ভর‍্যা গ্যাছে (গরুতে মাঠ ভরে গেছে)।

১.১.৪ নমঃশূদ্র—

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—

ক.	অ > অ্যা	=	খড় > খ্যাড়, কলা > ক্যালা
খ.	ই > উ	=	পাকামি > পাহামু, খরামি > খরামু
গ.	এ > আ	=	যেতে > জাতি, খেতে > খাতি
ঘ.	উ > ই	=	কবুতর > কবিতর, লাউ > লাই
ঙ.	ও > আ	=	উপোষ > উপাশ, গেঁয়ো > গাইয়্যা
চ.	ক > হ	=	টাক > ট্যাহা, উকুন > উহুন
ছ.	ট > ড	=	আটানা > আডানা, ব্যাটা > ব্যাডা
জ.	ত > ট	=	বালতি > বালটি, তাস > টাশ
ঝ.	প > ব	=	সুপারি > শুব্‌রি, কপাট > কবাট

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—

ক. লিঙ্গ—

যৌগিক শব্দে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়েও লিঙ্গ গঠন করা হয়। যেমন—ব্যাডা মানুষ-মাইয়্যা মানুষ, আবিয়া গরু- বক্‌না গরু, মদ্দাকুত্তা - মেচিকুত্তা ইত্যাদি।

খ. অনুসর্গ—

কিছু নতুন উপসর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—থোন (অর্থ - থেকে), লাইগ্যা (অর্থ - জন্য), করে (অর্থ - দিকে), কুনতামাত (অর্থ - কতদূর) ইত্যাদি।

গ. সর্বনাম—

প্রথম পুরুষবাচক সর্বনামগুলিতে নতুনত্ব দেখা যায়। যেমন—ও, ওই, অর, হে, হ্যায়, হেডা, তেনার, হ্যারা, ওগো, তাগো, হেডারা, উইয়্যার। নির্দেশক সর্বনাম পদগুলি হল—এইড্যা, এহেনত্যা, এমুড়া, এইদিষ্টা ইত্যাদি।

ঘ. সমাসবদ্ধ পদ—

দু-একটি ক্ষেত্রে বহুপদময় সমাসের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন—দ্বন্দ্ব-ছল-পল (ছেলেমেয়ে), ভাডিবুণ্ডি (ভাইবোন), দ্বিগু-পাশিক্যা (পাঁচসিকি), তিন্যাত্ (ত্রিনাথ), মদারু (নেশাখোর), অব্যয়ীভাব - পোদ্দিন (প্রতিদিন) ইত্যাদি।

১.১.৫ ব্রাহ্মণ—

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ব্রাহ্মণ জাতির কথ্যভাষায় আলাদা কোনো স্বাতন্ত্র্যতা চোখে পড়ে না। বাংলা মান্যচলিতেই তারা মূলত কথোপকথন করে থাকেন। আলাদা করে তাই মান্যচলিতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন আছে বলে বোধ হয় না।

১.২ মুসলিম সম্প্রদায়[৩]—

১.২.১ বাদিয়া[৪]—

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—

ক.	অ > অ্যা	=	কখন > ক্যাখুন, কত > ক্যাত্লা
খ.	আ > ও	=	মাসি > মোসি, পাগ্রি > পোগ্রি
গ.	ই > আ	=	ঝাপ্নি > ঝাপ্না, কিরিয়া > কিরা
ঘ.	উ > ও	=	গুমান > গোমান, গুদাম > গোদাম
ঙ.	এ > ই	=	কেস্সা > কিস্সা, এবাদত > ইবাদত
চ.	ও > অ	=	পোলাও > পলাও, ওজর > অজর
ছ.	ক > খ	=	দোজক > দোজখ, বকশিস > বখশিস

জ. ট > ঠ = হাইট্যা > হাইট্যা, খাট্‌ট্যা > খাট্‌ঠ্যা

ঝ. ন > ল = নাচার > লাচার, নসির > লশিব

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—

ক. নামধাতু—

বিশেষ্য, বিশেষণ পদে আ, ইছে যোগ করে ও তার সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে নামধাতু পদ গঠিত হয়। যেমন—মাপ + আ + ইব্যা = মাপাইব্যা, গুণ + আ + ইব্যা = গুনাইব্যা, সিজ + (সেদ্ধ) + ইছে = সিজাইছে, জুতা + বো = জুতাবো ইত্যাদি।

খ. উপসর্গ—

কয়েকটি বিদেশী (ফারসী ও ইংরেজী) উপসর্গের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

গর — গরহজম, গরমিল

বদ — বদমাস, বদনাম

বে — বেইমান, বেজ্জত

হেড — হেডমুলবি, হেডমাশটর

গ. অনুসর্গ—

অনুসর্গ নির্দেশক শব্দগুলি হল— হোতে < হইতে, মোইদ্দ্যে < মধ্যে, লাইগ্যা < লাগিয়া, দিয়্যা < দিয়ে ইত্যাদি। কয়েকটি বিশিষ্ট অনুসর্গ হল— লোগি (অর্থ - সঙ্গে), তনে/তানে, (অর্থ - জন্য), পাকে (অর্থ - দিকে)।

ঘ. সর্বনাম—

প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদে বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন— কে, কায়, কোন্‌ডা, ক্যানে, কোন্‌লা, কুন্‌টি, ক্যায়সে, কেৎখুনা, কুনঘুরি, কিউ, কুছু ইত্যাদি।

ঙ. শব্দদ্বৈত—

বিশেষ বিশেষ শব্দদ্বৈতগুলি হল—আমনা সামনা (অর্থ - সামনা সামনি), কুটমূট (অর্থ - মিথ্যা), ভংচং (অর্থ - আবোল তাবোল), বুঝাবুঝা (অর্থ - নেভা নেভা), গুমসুম (অর্থ - চুপচাপ), ভালাবুরা (অর্থ - ভালোমন্দ), নট্‌খট্‌ (অর্থ - দুষ্টু) ইত্যাদি।

১.২.২ বাঙ্গাল—

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—

ক.	অ > উ	=	যদি > যুদি, কাফন > কাফুন
খ.	আ > অ্যা	=	ভাই > ভ্যাই, হাসুয়া > হ্যাইস্‌সা
গ.	ই > এ	=	কিনারা > কেনারা, বিলাইতি > বেলাইতি
ঘ.	উ > চঅ্যা	=	হাঁটু > হাইট্যা, তালু > ত্যাইল্যা
ঙ.	এ > আ	=	নেড়া > নাড়া, ছেঁদা > ছাদা
চ.	ও > উ	=	গোমান > গুমান, খোদা > খুদা
ছ.	খ > ক	=	কেরখা > বুরকা, মুখ > মুক্‌
জ.	ত > দ	=	বোতাম > বুদাম, গীত > গীদ
ঝ.	ব > ম	=	জবা ন > জমান, তাঁবু > তামু

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. লিঙ্গ—

লিঙ্গ প্রকরণযুক্ত নানা শব্দ পদের বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— ছৌড়া- ছৌড়ী (অর্থ - ছেলে-মেয়ে), নানাদি-আনাদি (অর্থ - ননদ-ননদী), সাব-বিবি (অর্থ - স্বামী-স্ত্রী) ইত্যাদি।

খ. অনুসর্গ—

বিশেষ বিশেষ অনুসগর্রে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—লগে (অর্থ - সঙ্গে), তনে (অর্থ - জন্য), হনে (অর্থ - জন্য), হতে (অর্থ - থেকে) ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ - হামার তনে আকটা চা দে (আমরি জন্য একটা চা দে)।

গ. ক্রিয়া—

ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য অনেকাংশে হিন্দি ভাষার সমতুল্য। যেমন— বোল্‌দো (বলে দাও), কারায়া (করিয়ে), দিখায়ে (দেখিয়ে) ইত্যাদি।

ঘ. শব্দদ্বৈত—

নতুন নতুন শব্দদ্বৈতের ব্যবহার বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন—চন্‌চন্‌ (অর্থ - চড়া/ বেশী), টরটর (অর্থ - শক্ত), ড্যাংড্যাং (অর্থ - ফেটে চৌচির), এঁচপেঁচ

(অর্থ - বিরক্তভাব) ইত্যাদি।

জাতিভেদে উত্তর দিনাজপুর জেলায় যে ভাষা পরিবর্তন লাভ করে তা আরও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত করার জন্য কালভেদে ক্রিয়ার রূপের রূপবৈচিত্র্য তুলে ধরা হল[৫]—

√ দেখ্								
বর্তমান কাল								
জাতি	**উত্তম পুরুষ**		**সাধারণ**		**ঘটমান**		**পুরাঘটিত**	
	একবচন	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**
ব্রাহ্মণ	আমি	আমরা	দেখি	দেখি	দেখছি	দেখছি	দেখেছি	দেখেছি
দেশীয়	মুই	হামরা	দখ	দিখি	দখং	দিখিছি	দিখিয়াউ	দিখিয়াই
পলিয়া	মুই	হামরা	দ্যাখ	দেখি	দ্যাখ্যাশু	দ্যাখ্যাশি	দেখিশু	দেখিশি
কাপালি	আমি	আমরা	দেহি	দেহি	দেক্তাশি	দেক্তাশি	দেইক্শি	দেইক্শি
নমঃশূদ্র	আমি	আমরা	দ্যাহি	দ্যাহি	দ্যাকতাসি	দ্যাক্তাসি	দ্যাক্সি	দ্যাক্সি
বাদিয়া	হামি	হামরা	দেখি	দেখি	দ্যাখছি	দ্যাখছি	দ্যাখ্যাছি	দ্যাখ্যাছি
বাঙ্গাল	মুই	মোরা	দেখি	দেখি	দেখছু	দেখছু	দেখিয়াছি	দেখিয়াছি

√ দেখ্										
অতীত কাল										
জাতি	**উত্তম পুরুষ**		**সাধারণ**		**ঘটমান**		**পুরাঘটিত**		**নিত্যবৃত্ত**	
	একবচন	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**
ব্রাহ্মণ	আমি	আমরা	দেখলাম	দেখলাম	দেখছিলাম	দেখছিলাম	দেখেছিলাম	দেখেছিলাম	দেখতাম	দেখতাম
দেশীয়	মুই	হামরা	দিখিয়াউ	দিখিয়াই	দখছুনু	দখছন	দিখিয়ানু	দিখিয়ান	দখছুনু	দখছন
পলিয়া	মুই	হামরা	দেখিশু	দেখিশি	দ্যাখ্যাশুনু	দ্যাখাশ্ন	দেখিশিনু	দেখিশন্	দ্যাখ্যাছুনু	দ্যাখ্যাছন
কাপালি	আমি	আমরা	দ্যাক্লাম	দ্যাক্লাম	দ্যাক্শিলাম	দ্যাক্শিলাম	দ্যাকেশিলাম	দ্যাকেশিলাম	দ্যাকতাম্	দ্যাকতাম্
নমঃশূদ্র	আমি	আমরা	দ্যাক্লাম্	দ্যাক্লাম	দ্যাক্সিলাম	দ্যাক্সিলাম	দ্যাকেসিলাম	দ্যাকেসিলাম	দ্যাক্তাম্	দ্যাক্তাম্
বাদিয়া	হামি	হামরা	দেখনু	দেখনু	দেখছিনু	দেখছিনু	দেখেছিনু	দেখেছিনু	দেখিতুঙ	দেখিতুঙ
বাঙ্গাল	মুই	মোরা	দেখনু	দেখনু	দেখিয়ানু	দেখিয়ানু	দেখিয়াছুন	দেখিয়াছুনু	দেখনু তেনে	দেখনু তেনে

√ দেখ্								
ভবিষ্যৎ কাল								
জাতি	**উত্তম পুরুষ**		**সাধারণ**		**ঘটমান**		**পুরাঘটিত**	
	একবচন	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**	**একবচন**	**বহুবচন**
ব্রাহ্মণ	আমি	আমরা	দেখব	দেখব	দেখতে থাকব	দেখতে থাকব	দেখে থাকব	দেখে থাকব
দেশীয়	মুই	হামরা	দিখিম্	দিখম্	দিখিতে থাকিম্	দিখিতে থাকম্	দিখিয়াউ	দিখিয়াই
পলিয়া	মুই	হামরা	দেখিম্	দেখম্	দেখতে থাকিম্	দেখতে থাকম্	দেখিয়া থাকিম	দেখিয়া থাকিমু
কাপালি	আমি	আমরা	দেখুম	দেখুম	দেহিতে থাহুম	দেহিতে থাহুম	দেহা থাইক্ব	দেহা থাইক্ব
নমঃশূদ্র	আমি	আমরা	দেখ্মু	দেখ্মু	দেকতে থাক্মু	দেক্তে থাক্মু	দেইকা থাইক্বো	দেইকা থাইকবো
বাদিয়া	হামি	হামরা	দেখবো	দেখবো	দেখিতে থাকবো	দেখিতে থাকবো	দেখ্যা থাকবো	দেখ্যা থাকবো
বাঙ্গাল	মুই	মোরা	দ্যাখমু	দ্যাখমু	দ্যাখ্তে থাকুম	দ্যাখতে থাকুম	দ্যাখতে থাকমু	দ্যাখতে থাকমু

এতক্ষণ আমরা জাতিভেদে ভাষা পরিবর্তনে ধ্বনিগত ও রূপগত বিশ্লেষণ করলাম। এবার আমরা বাক্যগত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। বাক্যের মাধ্যমেই প্রত্যেক জাতির ভাষাভেদ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আমরা একটি লোককথার গল্পকে মূল পাট হিসাবে ধরে নিয়ে তাকে জাতিভেদে অনুবাদ করে ভাষা পরিবর্তনকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরব।[৬]

মূল পাঠ (মান্য চলিত)

এক গাধা সিংহের চামড়ায় গা ঢেকে সিংহ সাজল। তাকে দেখে মানুষ কী জীবজন্তুরা পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড হল। প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় তার ছদ্মবেশ গেল খুলে। তখন তার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল। সবাই তার ঠকবাজি বুঝতে পেরে বেদম মার দিল।

১. দেশীয়—

এক কুনা গাধা সিংহের চামড়া পিন্ধি গাও ঢাকি সিংহ সাজিল্। উয়াক্ দেখি মান্ষি এমুনকি জীবজন্তুগিলাও ভয়্যে পালায়্যা গেইল্। কিন্তুক হুটুৎ করি এক কাইণ্ড হইল্। হুর্কা বাওয়ের ঝটপটানিৎ উয়ার ছদ্মব্যাশ গেইল্ খুলি। সেলা উয়ার ছাইচ্কার চেহারাকুনা নিকিলি গেইল্। সগায় উয়ার ঢং বুঝিবার পায়্যা টায়ব্যেটায় মাইরটা দিলে।

রূপান্তর—নৃপেন বর্মণ, বয়স - ৬১, কানকি, থানা - চাকুলিয়া।

২. পলিয়া—

এক গাধা সিংহর চামড়া গাউত্ ঢ্যেকা দিয়্যা সিংহ সাজিল্। ওক্ দেখিয়া লোক কি জীবজন্তর সুধায় ভয়ে পালায় গেল্। কিন্তুক আচকায় একটা কাণ্ডো হোল্। খুবেই বাতাসের ঝাপটাৎ অর ছদ্মব্যাশ গেল্ খুলে। তোখুন অর আসল চিহারা ব্যার হয়্যা গেলো। সভাই অর চালাকি বুজব্যের পায়্যা ধরে অক্ খুবই পিটন দিলে।

রূপান্তর—প্রাণকিশোর রায়, বয়স - ৫৮, টুঙ্গিদিঘি, থানা - করণদিঘি।

৩. কাপালি—

এ্যডা গাধা সিংগোর চামড়া গায়োত দিয়ে সিংগো সাচ্চিলো। ওডেক দেকে মানুষ কি জীবজন্তুরা পর্যুন্ত ভয় পায়্যা প্যালে গেলো। কিন্তু হটাত্ করে এ্যডা কাণ্ড হয়্যা গেলো। জোরে বাতাসের চোটে অর ছদ্মব্যাশ গেলো খুলে। তখন অর আসল চিহারা ব্যার হয়্যা গেলো। সভাই অর চালাকি বুজব্যের পায়্যা ধরে অক্ খুবই পিটন দিলো।

রূপান্তর—খগেনচন্দ্র মণ্ডল, বয়স - ৫৬, রাধানগর, থানা - ইটাহার।

৪. নমঃশূদ্র—

একডা গাদা সিংগর চামড়াতে শোইল ঢাইক্যা সিংগ সাজলো। অরে দেইখ্যা মানুশ কি জীবজন্তুগুলা পোরজন্ত ডরে পলাইয়্যা গ্যালো। কিন্তু হটাত্ একডা কান্ডো হোইলো। জোর হাবার ট্যালায় অর ছলব্যাশ গ্যালো খুইল্যা। তহন অর আসোল চ্যাহারা বাইর হইয়্যা গ্যালো। সব্বাই অর ধাপ্পাবাজি বুঝতে পাইর‍্যা বেদোম্ মাইর দিলো।

রূপান্তর—কার্তিক চন্দ্র সরকার, বয়স - ৬৫, কালীতলা, থানা - রায়গঞ্জ।

৫. ব্রাহ্মণ—

একটা গাধা সিংহোর চামড়ায় গা ঢেকে সিংহো সাজলো। তাকে দেখে মানুষ কি

জীবজন্তুরা পর্যন্ত ভয়ে পালায়্যে গেলো। কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ডো হোলো। খুব হাওয়ার ঝাপটায় তার ছদ্মবেশ গেলো খুলে। তখোন তার আসোল চ্যাহারা বেরিয়ে পোড়লো। সবাই তার ঠকবাজি বুজতে পেরে বেদোম মার দিলো।

রূপান্তর—কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বয়স - ৬৫, সুদর্শনপুর, থানা - রায়গঞ্জ।

৬. বাদিয়া—

একটা গাদ্ধা সিংহোর চামড়্যায় গা ঢ্যাকা সিংহো স্যাজল। অক্ দ্যাখ্যা মানুষ কি জানোয়ারগ্যালা পোরযোন্ত ডরে পালিয়্যা গ্যাল। কিন্তুক হট্ কইর‍্যা একটা কাণ্ডো হ্যোলো। খুভি বাতাসের চোটে ওয়ার আলকাপ্ গ্যাল খুইল্যা। তখুনি ওয়ার আসোল চ্যাহারা বাইর হয়্যা পোড়লো। সভ্যাই ওয়ার টকবাজি বুজতে প্যারা বেধড় মাইর লাগ্যালে।

রূপান্তর—খালেক রহমান, বয়স - ৬২, মজলিশপুর, থানা - গোয়ালপোখর।

৭. বাঙ্গাল—

একটা গুদ্ধা সিংহোর চামড়ায় গতরটা ঢাকায় লিয়ে সিংহো সাজলে। ওয়াক্ দেখে মানুষ কি জীবজন্তুগ্যালা ওয়াক্ ডরে পাল্যায় গেলো। কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ডো ঘটলে। খুব জোর বাতাসের ঝাপটায় ওয়ার ভেক্‌রেশটা গেলো খুলে। তখুনকা ওয়ার আসলি রূপটা বার হয়্যা গেলো। সভাই ওয়ার চালবাজি বুঝুহা পারে ধরে বেধম মার দিলে।

রূপান্তর—রহমত শেখ, বয়স - ৬৩, খন্তি, থানা - ইসলমাপুর।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের জাতিভেদে ভাষার যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা আমরা লক্ষ্য করলাম। জাতিভেদে বাক্য গঠনের তারতম্যও চোখে পড়ার মতো। আবার প্রত্যেক জাতির নিজস্ব শব্দভাণ্ডারও রয়েছে। অর্থাৎ শব্দপ্রয়োগের বিভিন্নতা জাতিভেদে পরিবর্তন লাভ করে।

এই পর্যন্ত আমরা বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের জাতিভেদে ভাষার যে পরিবর্তন তা দেখলাম। ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগত ও শব্দগত ভাবে বিশ্লেষণে এই তারতম্য আরও সুস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। জাতিভেদে ভাষার যে পরিবর্তন তা বয়স, কর্ম, অর্থনীতি, শিক্ষা, পরিবেশ, স্থান, শ্রোতা, উপলক্ষ, বাসস্থান প্রভৃতি ভেদে আবার পরিবর্তন যোগ্য। আবার প্রত্যেক জাতির ভাষায় যে অবিভাজ্য ধ্বনি অর্থাৎ শ্বাসাঘাত, যতি, দৈর্ঘ্য, সুরতরঙ্গ ইত্যাদি উচ্চারণভেদেও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

২. বয়স ভেদে ভাষা পরিবর্তন[৭]—

সমাজ ভাষা বিজ্ঞানে বয়স একটি বিশেষ মাপকাটি হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ জাতি, কর্ম, শিক্ষা, অর্থনীতি, পরিবেশ, স্থান, শ্রোতা, উপলক্ষ ইত্যাদির মতো বয়স ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সমাজের ভাষা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের প্রতিটি জিনিসই পরিবর্তিত হতে থাকে। জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তেমনি তার সঙ্গে তালমিলিয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে তার কথ্যভাষা বা মুখের ভাষা। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজস্ব শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

একটি শিশু যেমন বলে থাকে—তুই আমাল দিনিস ধব্‌বি না। (অর্থ - তুই আমার জিনিস ধ্বরি না)। আবার কখনো-আমি মামাল বালি দাবো। (অর্থ - আমি মামার বাড়ি যাবো)। এই সমস্ত বাক্য আমরা শুধুমাত্র শিশুদের মুখেই শুনতে পাবো বড়োদের মুখে কখোনোই শোনা যাবে না। আবার একটি বালক কখোনোই বলবে না যে—কর্পোরেট সেক্টরের বসগুলো প্রচণ্ড স্ট্রিক্‌ট্। অর্থাৎ সামাজিক ভাষার অন্তরালে বয়স একটি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।[৮]

আমরা পূর্ব, মধ্য ও উত্তর—এই তিনটি প্রজন্মের সূত্র ধরে বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষাকে বিশ্লেষণ করব। বয়সভেদে প্রত্যেক প্রজন্মকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব ভাষার নমুনার মাধ্যমে। নবীন, মধ্যবয়স্ক ও প্রবীণ—এই তিনটি প্রজন্মকে তাদের ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যগত প্রভেদগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরতে প্রয়াসী হব।

১. নবীন—

৩-৬ বৎসর

তি মোর বন্দুকটাত্ হাত নি লাগাবো, ইডা মোর সামান। (অর্থ - তুই আমার বন্দুকটাতে হাত লাগাবি না, এটা আমার জিনিস)।

আমরা বুঝতে পারি একটি ছোট ছেলে তার কোন বন্ধুর উদ্দেশ্যে এই কথাটি বলেছে। এই বয়সের ছেলেরা খেল্‌না হিসাবে বন্দুককে খুব পছন্দ করে। উদ্দিষ্ট বক্তাটি ছেলে, কারণ বন্দুক হল ছেলেদের খেলনার সামগ্রী। আর অন্যদিকে পুতুল হল মেয়েদের খেলনার সামগ্রী। ছেলেটি অপর বন্ধুকে তার বন্দুকে হাত লাগাতে নিষেধ করছে। এটা এই বয়সেরই খুব

স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আমরা জানি এই বয়সে ছেলে-মেয়েরা মানসিক ভাবে খুব বেশী উদার হয় না। সব কিছুকেই আমার বলতে থাকে। আবার এখানে শ্রোতা তার বন্ধু বা সমবয়সী না হয়ে বড় মানুষও হতে পারে। এখানে বক্তা যেহেতু ছোট, তাই এই বয়সে সে পুরুষ বাচক সর্বনামের সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ নয়। এই বয়সে ছেলে- মেয়েরা তার থেকে ছোট, সম ও বড় সবাইকেই 'তুই' বলে সম্বাধন করে থাকে। এখানে 'তি' এর মধ্য দিয়ে শ্রোতার বয়স অনুমান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে বক্তা যে ছোট সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।

৭-১২ বৎসর—

কি বাত কোহছিস, ইডা মাঠত্ ভূত ছে? মি ঘর যাছু। (অর্থ - কি কথা বলছিস, এই মাঠে ভূত আছে? আমি ঘরে/বাড়ি যাচ্ছি)।

ভূতপ্রেত, অলৌকিক ঘটনা, অশরীরী আত্মা এই সমস্ত বিষয় ছোটদের প্রবল আকৃষ্ট করে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক বিষয়বস্তু এক অপার রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করে। তারা এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি যেমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে তেমনি প্রচণ্ডভাবে তাদের মনের মধ্যে পাশাপাশি ভয়ও কাজ করে। তারা ভূতপ্রেত-এর গল্প শুনতে পছন্দ করে কিন্তু ভূতপ্রেত-এর নামে প্রচণ্ড ভয় পায়। তাই বক্তা যখন অন্য বন্ধুর কাছে শোনে এই মাঠে ভূত আছে তখন সে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয় ও তার মধ্যে পাশাপাশি ভয়ও কাজ করে। তাই সে বন্ধুর কথায় কিছুটা অবিশ্বাসী ও শিহরিত হয়ে বলে 'কি বাত কোহছিস', ইডা মাঠত্ ভূত ছে? এবার সে ভয়ার্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় বাড়ি ফিরে যাবার। তাই বলে মি ঘর যাছু। বালক বালিকাদের মধ্যে এই বিস্ময়, রোমাঞ্চ, শিহরণ, ভয় কাজ করলেও বড়দের মধ্যে তা দেখা যায় না। কারণ তখনও যুক্তিবাদী, বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত মন তাদের তৈরী হয়নি।

১৩-১৮ বৎসর—

দ্যাখ, দ্যাখ, বাবা হামাক সাইকেলটা খরিদ্যে দিলো। (অর্থ - দেখ, দেখ, বাবা আমাকে সাইকেলটা কিনে দিল)।

এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের সাইকেল এর প্রতি এক বিশেষ টান থাকে। কারণ সাইকেল হল একটা বাহন। এই বাহনে চেপে নিজের ইচ্ছে খুশি মতো যেখানে মন চায় ঘুরে বেড়ানো যায়। এ যেন বহির্বিশ্বের সঙ্গে নতুন যোগাযোগের অন্যতম সেরা মাধ্যম। পাশাপাশি

সাইকেল প্রয়োজনেরও সামগ্রী। এই বয়সে তাই উপযুক্ত বাহন হল সাইকেল। আর বাড়ির উপার্জনশীল কর্তা হল বাবা। বাবা ছেলেকে সাইকেল কিনে দিয়েছে। ছেলেটি বন্ধুমহলকে তার সাইকেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। নিজস্ব নতুন জিনিসকে অপরকে দেখিয়ে আত্মতুষ্টি হয়। তাই সে মনের মধ্যে প্রবল উৎসাহ, উত্তেজনা, অস্থিরতা নিয়ে অন্যদের বলে—দ্যাখ, দ্যাখ। অন্যদের সাইকেল দেখিয়ে সে আত্মতুষ্টি অনুভব করে। সাইকেল কেনার ক্ষমতা তখনও তার মধ্যে আসেনি কারণ সে উপার্জনশীল নয়। এই বয়সে এটাই স্বাভাবিক। তাই তাকে তার বাবা সাইকেলটি কিনে দিয়েছে। উদ্দিষ্ট বক্তার বয়স যদি ২৫ এর অধিক হত তবে সে নিজে উপার্জন করে নিজেই নিজের সাইকেল কিনে নিত। ওই বয়সে তার সংসারের হাল ধরার কথা। তাই তার বাবা কিনে দিয়েছে বলাটা লজ্জার ব্যাপার। আর তা হলেও সে অন্য কাউকে অধীর আগ্রহ নিয়ে দেখাতে চাইতো না।

১৯-২৫ বৎসর—

দ্যাখ, মোর Post-এ ক্যাত্‌লা like আর দ্যাছে। তিভি share করে লে। (অর্থ - দেখ্, আমার post-এ কত like আর comment দিয়েছে। তুই ও share করে নে)।

মাধ্যমিক পাশ করার পর ছেলে- মেয়ের আবদার রক্ষা করার জন্য বাবা-মায়েরা সন্তানদের হাতে নতুন মোবাইল কিনে দেন। যদিও এই বয়সের ছেলে - মেয়েদের মোবাইল জ্ঞান আগে থেকেই সঞ্চিত থাকে, তবুও নিজের মোবাইল হাতে পাবার পর সে আরও বেশী রপ্ত হতে চায়। Smart phone বা Android phone-এর বিভিন্ন Application ও Social networking site গুলোর প্রতি প্রবল আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা orkut, Facebook, Whatsapp, imo, Messenger ইত্যাদিতে Chat করার জন্য নিজস্ব Account খুলে নেয়। এই বয়সের ছেলে মেয়েরা আজকাল মোবাইল সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। বাসে, ট্রামে, অটোতে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, স্কুল-কলেজে, পার্কে, রকে প্রায় সব জায়গাতেই এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মোবাইল ঘাটতে দেখা যায়। এখানে বক্তা Facebook এ একটি post -এ কত like আর comment পড়েছে তা অন্য বন্ধুদের বা বন্ধুকে দেখাচ্ছে। তাদের মানসিকতা যে যত বেশী like আর comment পাবে সে ততবেশী বিখ্যাত। তারা virtual world-এ থাকতে পছন্দ করে এবং তার মধ্যদিয়েই তারা ভালো-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ, বিখ্যাত-অখ্যাত, সম্পর্ক, ভালোবাসা, যোগাযোগ ইত্যাদি বজায় রাখতে চায়। তাই বক্তা তার বন্ধুকে নিজের

post টি share করে নিতে বলে। অর্থাৎ সে তার মধ্যদিয়ে বন্ধুকেও বিখ্যাত হবার offer করে। এই প্রবণতা এই বয়সেই সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়।

২. মধ্যবয়স্ক

২৬-৩৫ বৎসর

ঘর যাবার মন নি চাহাছে। হরদিন বিবির ঘ্যানঘ্যানানি শুনবা আচ্ছা নি লাগে। (অর্থ - ঘর/বাড়ি যেতে মন চাইছে না। প্রতিদিন বউয়ের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে ভালো লাগে না)।

এই বয়সে বেশীর ভাগ ছেলেরাই সংসারী হয়ে পড়ে। বক্তা যখন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে তখন আড্ডা ছেড়ে তার বাড়ি যেতে মন চায় না। বিয়ের আগে ছেলেরা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে থাকে ও বন্ধু মহলে প্রচুর সময় কাটায় কিন্তু বিয়ের পর সেই আড্ডায় একটা ছেদ বা বাঁধা পড়ে কারণ পরিবারকে সময় দিতে হয়। পরিবারের স্বাভাবিক নিয়মে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া-বিবাদ হয় ও তার ফলে তিতিবিরক্ত ভাব জন্মায়, বিয়ের কয়েক বছর অতিবাহিত হবার পর বক্তার এই অভিজ্ঞতা। প্রথম ছয় মাস বা একবছরে সচরাচর এই উক্তি শোনা যায় না। বউয়ের কথাগুলো বক্তার কাছে একঘেয়েমী, নিরর্থক ও বিরক্তি জনক। তাই সে 'ঘ্যানঘ্যানানি' ধ্বন্যাত্মক অব্যয়টির দ্বারা প্রচণ্ড বিরক্তিভাবকে বোঝাতে চাইছে। একজন অল্পবয়স্ক অবিবাহিত বালকের মুখে এই কথা আশা করা যায় না। অন্যদিকে প্রৌঢ় ব্যক্তি সংসারের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে নির্বিকার ও নির্লিপ্ত হয়ে যান, তার মুখেও এই ধরণের বাক্য শোনা যায় না। উক্ত বাক্যটি একটি নির্দিষ্ট বয়সকেই নির্দেশ করে থাকে। আর তা বুঝতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না।

৩৬-৫৫ বৎসর—

মোর বেটাটা আভিতক্ আপ্না পায়ে খাড়া হবার নি পারিল্। (অর্থ - আমার ছেলেটা এখনো পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়া হতে পারলো না)।

বাক্যটিতে একটি পিতার আক্ষেপের সুর ধরা পড়েছে। বক্তা নিজের ছেলের সম্পর্কে মন্তব্যটি করেছে। ছেলেটি এখনো পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি অর্থাৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। নিজের পুত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রত্যেক পিতাই ওয়াকিবহাল ও চিন্তিত থাকে। কারণ পুত্রের দায়ভার পিতার উপরেই বর্তায়। তাই সঠিক সময়ে পুত্র যদি কর্মক্ষম বা

প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তাহলে পিতা দুঃশ্চিন্তায় আক্রান্ত হন। অল্প বয়সের ছেলের মুখে এ উক্তি অত্যন্ত বেমানান আর প্রৌঢ় ব্যক্তির ছেলে কোন না কোনো কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে যায়। ফলে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পিতার মুখেই এই সমস্ত বাক্য শোনা যায়।

২. প্রবীণ—

৫৬-এর উর্দ্ধে

ইডা সংসার সেরেফ মায়ার খেল্। (অর্থ - এই সংসার শুধু মায়ার খেলা)।

বাক্যটির মধ্যদিয়ে সংসার সম্পর্কে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে। বক্তা সংসারকে শুধু মায়ার খেলা বলছেন। সংসার জীবনের একেবারে প্রান্তে এসে বক্তার এক বিশেষ উপলব্ধি তিনি ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এখানে বক্তা সংসার জীবনের সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। সংসারের বাবা-মা, ভাই, বোন, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-পরিজন সবাই শুধুমাত্র মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ— আর কিছু নয়। এই বিশেষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তার মধ্যে ধরা পড়েছে। আর এই উপলব্ধি সংসারহীন অল্পবয়স্ক ব্যক্তির কাছে ধরা পড়বে না আবার সদ্য সংসারী বা সংসার জীবনের মধ্য গগনে এসেও এই উপলব্ধি জাগ্রত হবে না। শুধুমাত্র সংসার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত বা সংসার অতিক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষেই এই বিশেষ বোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভব। তাই উদ্দিষ্ট বক্তা যে প্রবীণ সে বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না।

এবার আমরা প্রবীণ, মধ্যবয়স্ক ও নবীন এই তিনটি প্রজন্মের ভাষার নমুনাকে পাশাপাশি রেখে তাদের ধ্বনিগত, শব্দগত ও বাক্যগত পার্থক্যগুলিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবো—

১. ওইসব টাকার গরম আমাদের দেখিয়ে লাভ নেই।

প্রবীণ - ঔলা প্যাইসার গোর্মি হামারঘোরের দিখায্যে লাভ নাই।

মধ্যবয়স্ক - ওলা প্যাইসার গর্মি হামারযে দিখায়্যে লাভ নাই।

নবীন - ওইলা পয়সার গর্মি হামসাক্ দেখ্যায়ে লাভ নাই।

একটি নমুনা বাক্যের মধ্যদিয়ে তিনটি প্রজন্মের কথ্যভাষার প্রভেদকে স্পষ্ট রূপদান করা হয়েছে। প্রবীণদের ভাষায় রক্ষণশীলতা ও নবীনদের মান্য চলিতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার প্রয়াস ধরা পড়েছে। আর মধ্যবয়স্করা এক দোলাচলের মধ্যে অবস্থান করছে অর্থাৎ প্রবীণদের রক্ষনশীলতা ও নবীনদের মান্যচলিত অভিমুখীনতা এই দুটো বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়েছে। প্রবীণেরা

ঔলা আর মধ্য বয়সীরা ওলা ব্যবহার করছে। ঔলা > ওলা = 'ই' লোপ অর্থাৎ মধ্য স্বরলোপ সংগঠিত হচ্ছে। প্যাইসাকে নবীনেরা পয়সা বলছে। প্যাইসা > পয়সা 'অ্যা' লোপ, মধ্যস্বর লোপ ঘটছে। গোরমি > গর্‌মি = 'ও' লোপ, মধ্য স্বরলোপ হয়েছে। 'আমাদের' তিনটি প্রজন্ম তিন রকম উত্তম পুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করছে। নবীনেরা 'দিখায়্যে' কে 'দেখ্যায়ে' বলছে। দিখায়্যে > দেখ্যায়ে ই > এ, য'-ফলা ব্যবহার ও শব্দান্তে য'-ফলা হ্রাস পাচ্ছে। লাই > নাই = ল > ন অর্থাৎ মান্যচলিতে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে। একটি তালিকার মাধ্যমে বাক্যটির পরিবর্তন সুন্দরভাবে ধরা যাবে।

প্রবীণ	ঔলা	প্যাইসার	গোরমি	হামারঘোরের	দিখায়্যে	লাভ	নাই
মধ্য	ওলা	প্যাইসার	গর্‌মি	হামারঘে	দিখায়্যে	লাভ	নাই
নবীন	ওইলা	পয়সার	গর্‌মি	হামসাক্	দেখ্যায়ে	লাভ	নাই
মান্য	ওইসব	টাকার	গরম	আমাদের	দেখিয়ে	লাভ	নাই

২. ভাই পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে এলো।

প্রবীণ - ভেই পৈখোর সে মোছ্‌লি পাক্‌রি লিয়ে ওল্‌।

মধযবয়স্ক - ভ্যাই পোখোর সে মছ্‌লি পাক্‌রি লিয়ে অল্‌।

নবীন - ভাই পুখুর সে মচ্‌লি পাক্‌রে নিয়ে অল্‌।

উক্ত বাক্যটিতে প্রবীণ ও মধ্যবয়স্কদের ভাষার তেমন পার্থক্য নেই। এখানে মধ্যবয়স্করা রক্ষণশীল ভাষার পরিচায়ক। এরা কখনো প্রবীণদের প্রতি আবার কখনো নবীনদের প্রতি পা বাড়ায়। 'ভাই'কে প্রবীণরা 'ভেই' বলছে আর মধ্যবয়স্করা 'ভ্যাই'। ভেই > ভ্যাই = এ > অ্যা ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে। তিন প্রজন্ম 'পুকুর'কে তিন রকম বলছে - পৈখোর > পোখোর > পুখুর > পুকুর। মধ্যবয়স্ক - পৈখোর > পোখোর = ঐ > ও, নবীন - পোখোর > পুখুর = ও > উ ধ্বনি পরিবর্তন করে উচ্চারণ করছে ও ধীরে ধীরে মূলরূপ 'পুকুর' শব্দের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মাছ'কে 'মোছলি' হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেছে। মোছলি > মছ্‌লি 'ও' লুপ্ত, মধ্য স্বরলোপ উচ্চারণ করছে মধ্যবয়সীরা, আর নবীনেরা - মছ্‌লি > মচ্‌লি = ছ > চ, অল্প প্রাণীভবন ঘটছে। নবীনেরা পাকরি > পাকরে = ই > এ ধ্বনি পরিবর্তন করে উচ্চারণ করছে। একমাত্র প্রবীণেরা 'ওল' রূপ ধরে রেখেছে। আর মধ্য ও নবীনেরা 'অল' বলছে।

আবার নবীনেরা মান্যচলিতের দিকে অগ্রসর হওয়ায় 'লিয়ে' কে 'নিয়ে' লিয়ে > নিয়ে = ল > ন উচ্চারণ করে। নিম্নে তালিকায় আরও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হল।

প্রবীণ	ভেই	পৈখোর	সে	মোছলি	পাক্‌রি	লিয়ে	ওল্‌
মধ্য	ভ্যাই	পোখোর	সে	মছ্‌লি	পাক্‌রি	লিয়ে	অল্‌
নবীন	ভাই	পুখুর	সে	মচ্‌লি	পাক্‌রে	নিয়ে	অল্‌
মান্য	ভাই	পুকুর	থেকে	মাছ	ধরে	নিয়ে	এলো

আরও কয়েকটি তালিকার মাধ্যমে তিন প্রজন্মের ভাষারীতির প্রভেদগুলো তুলে ধরা হল—

প্রবীণ	হামি	অর্‌	শাকেল্‌	চালহাবা	পারিম্‌ ⇌	নি
মধ্য	হামি	অর্‌	স্যাক্যাল্‌	চালাবার	পারিম্‌ ⇌	নি
নবীন	মি	আর	স্যাইক্যাল্‌	চালাবা	পারিম্‌ ⇌	নি
মান্য	আমি	আর	সাইকেল	চালাতে	পারবো ⇌	না

প্রবীণ	ওয়াক	ইধার	বুলায়	লিয়ে	ওস্‌
মধ্য	ওয়াক	এধার	ডাকি	লিয়ে	অস্‌
নবীন	অক্‌	ইহা	ডাকে	নিয়ে	অস্‌
মান্য	ওকে	এখানে	ডেকে	নিয়ে	আয়

৩. সামাজিক শ্রেণিভেদে ভাষা পরিবর্তন[৯]—

সমাজিক শ্রেণিভেদে বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষাকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নেবো—১. কর্মভেদে বা পেশাভেদে, ২. অর্থনৈতিক অবস্থা ভেদে ৩. শিক্ষা ভেদে। এই তিনটি মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক শ্রেণী নির্ভরশীল।

৩.১ কর্মভেদে বা পেশাভেদে ভাষা পরিবর্তন[১০]—

কর্ম বা পেশা অনেক ক্ষেত্রেই ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পেশা-পরিবেশ ও পেশা সম্পর্কিত অনেক শব্দ তাদের ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। তাই পেশা-পরিবেশ

অনেকাংশে ভাষা-পরিবেশ সৃষ্টি করে। কর্মভেদে বা পেশাভেদে ভাষা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ক. অফিস কর্মী— বস্ যা স্ট্রীক্ট্, আজই ফাইলটা রেডি করতে হবে।

বস্, স্ট্রীক্ট্, ফাইল, রেডি ইত্যাদি ইংরেজী শব্দগুলিই এই পেশা পরিবেশকে চিত্রিত করে। বস্ ও ফাইল শব্দ দ্বারাই বোঝা যায় বাক্যটি একটি শিক্ষিত কর্মী।

খ. দিন-মজুর—মালিক খুবেই রাগাল, অ্যাকটুকা বিড়্হি টাইনব্যার ফুইরস্যাত ল্যাই।

বক্তা মালিকের অধস্তন কর্মী। বিড়ি টানার কথা থেকেই বোঝা যায় যে নিম্নবিত্তের মানুষ। আর বাক্যটি ভাষাগত বিশ্লেষণে বোঝা যায় বক্তা অক্ষিশিত বা স্বল্প শিক্ষিত। শিক্ষক, নেতা, অফিস কর্মীর মুখে এ ভাষা আশা করা যায় না।

গ. গ্যারেজ কর্মী—সকাল বেলাটা পাংচার হোইংগেল।

'পাংচার' শব্দটি বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত। তাই বক্তা যে গ্যারেজকর্মী তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

ঘ. সব্জি বিক্রেতা—যাঃশালা বোহনির সুম্যা গণ্ডগোল হয়্যা গেল্।

'বোহনি' শব্দের অর্থ হল প্রথম বিক্রি হওয়া। ' বোহান' শব্দটি আলোচ্য জেলার সব্জি বিক্রেতারাই সর্বাধিক ব্যবহার করে থাকেন। অন্য পেশার মানুষ ' বোহনি' খুব একটা প্রয়োগ করে না।

ঙ. শিক্ষক —সাজেক্ট্ এ পাশ কিন্তু এগ্রিকেট-এ ফেল করেছিস। আর এটেণ্ডেন্টস্ খুবই কম।

বক্তা সাজেক্ট্, এগ্রিকেট, পাশ-ফেল, এটেণ্ডেন্টস্ নিয়ে শ্রোতাকে বলছে। এই শব্দগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। তাই বক্তা যে একজন শিক্ষক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

চ. নেতা—বন্ধুগণ, আমরা একজোট হয়ে প্রতিবাদে সামিল হব।

বক্তা শ্রোতাদের 'বন্ধুগণ' বলে সম্বোধন করছেন আর প্রতিবাদে একজোট হতে বলছেন। নেতৃত্ব কোনো পেশা নয় কিন্তু নেতারা দেশের কর্মী ও নেতাগিরি তাদের পেশা। বাক্যটি একবার শুনলেই আন্দাজ করা যায় বক্তা অবশ্যই নেতা। কারণ অন্যকোন পেশার মানুষের মুখে একথা কখোনই শোনা যাবে না।

ছ. ভিক্ষুক—দুই দিন থিক্যা না খাইয়্যা আছি, বাবু দুইডা পয়সা দেন্ না।

বক্তা শ্রোতাকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করছেনও 'দুইডা পয়সা' চাইছেন কিছু খাবারের জন্য। এখানে বক্তা যে ভিক্ষা চাইছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই বক্তা ভিক্ষুক-এর ভাষায় কথা বলছেন।

জ. জেলে—আজ জালে বহুৎলা মাচ্ ধরা পড়িচে।

বক্তা তার নিজের জালে অনেক মাছ ধরা। পড়ার কথা শোনাচ্ছে। জাল দিয়ে মাছ ধরার পেশা জেলেদের। তাই বোঝা যায় বক্তা একজন জেলে।

ঝ. মুদি দোকানী—খরিদ্দারক্ বাকি দিতে দিতে পুঁজি-বাট্টা সব খতম্ হোইংগেল।

খরিদ্দারকে বাকি দিতে দিতে পুজি-বাট্টা শেষ হয়ে যাবার কথা বলছে বক্তা। 'পুঁজি-বাট্টা' বলতে এখানে ব্যবসার মূলধন বা টাকাকে বোঝানো হচ্ছে। মুদি দোকানে বাকি দেবার রীতি থাকলেও তা সাপ্তাহিক বা মাসিক হারে। এর বেশী সময় হলে দোকানীর মূলধনে হাত পড়ে। তাই দোকানী খেদ প্রকাশ করে আলোচ্য বাক্যটি প্রয়োগ করেছে।

ঞ. কৃষক—ই-বছর ভালো বিশ্‌টি হইছিল্, জমিত্ ম্যেলা ধান হোইবে।

বক্তা জমি, ধান, বৃষ্টি সংক্রান্ত কথা বলছে। তাই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বক্তা একজন কৃষক। এই বছর ভালো বৃষ্টি হয়েছে, আগের বছর হয়নি—এই বিশেষ অভিজ্ঞতা কৃষকদেরই থাকে।

ট. গৃহস্থ—ওই ছোরাটা মোর বেটিটার ইজ্জত আব্রু সব মারিয়া মিট্ করি দিলো।

বক্তা নিজের মেয়ের সম্পর্কে কথাগুলো বলেছে একটি অল্প বয়স্ক ছেলেকে উদ্দেশ্য করে। বক্তার বক্তব্য ঘরোয়া ও ঘর-গৃহস্থালী সম্পর্কিত। তাই বক্তা যে গৃহস্থ মানুষ তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

৩.২ অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে ভাষা পরিবর্তন[১১]—

অর্থনৈতিক তারমত্য হেতু যেমন সামাজিক শ্রেণি নির্ণীত হয় তেমনি শ্রেণির তারতম্য হেতু ভাষা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য জেলায় অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে মূলত তিনটি শ্রেণিতে সমাজকে বিভক্ত করা যায়—১. উচ্চবিত্ত শ্রেণি (Upper Class) ২. মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle Class) ৩. নিম্নবিত্ত শ্রেণি (Lower Class)। এবার আমরা অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে সামাজিক শ্রেণিভেদে ভাষা পরিবর্তনকে তুলে ধরব—

৩.২.১ উচ্চবিত্ত শ্রেণি (Upper Class)

আমি যদি চাইতাম নিজের স্বামীর সামনে আপনার গোপন ফাঁস করতে পারতাম। কিন্তু তাতে মা- ছেলের সম্পর্ক চিরদিনের মতো ভেঙ্গে যেত। ঐ সম্পর্ক বাঁচাবার জন্য আমি ঐখান থেকে চুপচাপ চলে গিয়েছিলাম। যদি আপনি ভাবছেন যে আপনার জয় হয়েছে তাহলে এটা আপনার ভুল।

৩.২.২ মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle Class)

মুই চাহানু তান্তে আপনা পতির সামনাত্ তোর ভাণ্ডা ফোরবা সাক্ছিনু। লেকিন মা-বেটার রিস্তা হামেসারকার তানে ছুটে গেল্ তায়। ওহেরা রিস্তা বাচবার তানে মুই ঐছিন সে চুপচাপ চালে গেইনু। আগর তুমি সোচ্ছেন কি তোমার জিত হইছে তো ইডা তোমার ভুল ছে।

৩.২.৩ নিম্নবিত্ত শ্রেণি (Lower Class)

মি চাহানু তান্তে মোর পোতির সামনাত্ তোর ভাণ্ড্যা ফুরবা সাক্ছিনু। লেকিন মা-বেটার রিস্তা হামেশারকার তনে তায় ছুটে গ্যাল্। ওডা রিস্তা বাচার তনে মি ঐছিন সে চুপেচাপে চোলে গেনু। অগর তুমি সোচ্ছেন কে তুমার জিত হৈছে তো ইডা তুমার ভুল ছে।

উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণির ভাষার যে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল তা অবশ্যই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চ-মধ্য ও নিম্নবিত্তের কথ্যভাষার পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। উচ্চবিত্তের মানুষেরা বেশীর ভাগ শহর লাগোয়া বা বাজার লাগোয়া বা শহড়ে অবস্থান করেন। তাই তাদের কথ্যভাষা মূলত মান্যচলিত। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ভাষায় বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। উত্তম পুরুষ সর্বনাম হিসাবে উচ্চবিত্ত 'আমি' বলছে কিন্তু মধ্যবিত্ত 'মুই' আর নিম্ন বিত্ত 'মি' বলছে। মধ্য ও নিম্নবিত্ত 'তাতে' কে তান্তে, তাতে > তান্তে 'ন' এর আগম অর্থাৎ মধ্য ব্যঞ্জনাগম ঘটেছে। উচ্চবিত্ত 'নিজের' মধ্যবিত্ত 'আপনা' নিম্নবিত্ত 'মোর' উচ্চারণ করছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত কথ্যভাষায় প্রচুর হিন্দি শব্দের, ভোজপুরি শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন। 'জন্য' অনুসর্গের বদলে মধ্য বিত্তরা 'তানে' ও নিম্নবিত্তরা 'তনে' ব্যবহার করেছে। আবার 'তান্তে' শব্দর মধ্যদিয়ে 'যদি' বোঝানো হয়েছে। 'তাতে'র বদলে তায়' ব্যবহার করেছে মধ্যবিত্তের মানুষেরা 'ঐ' কে 'ওহেরা' ও 'ওডা' বলা হয়েছে। নিম্নবিত্তেরা চুপচাপ > চুপেচাপে এ -র আগম ঘটিয়ে উচ্চারণ করেন। মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থে 'আপনি'-র বদলে মধ্যবিত্ত ও

নিম্নবিত্ত 'তুই' অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত সর্বনাম পদ ব্যবহার করে থাকেন। আবার কখনো 'আপনি'র বদলে 'তুমি' অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের সাধারণার্থে ব্যবহৃত সর্বনাম পদ ব্যবহার করে থাকেন। নিম্নবিত্ত ' তোমার' কে 'তুমার', তোমার > তুমার = ও > উ স্বরধ্বনি পরিবর্তন করে উচ্চারণ করে থাকেন। উচ্চবিত্ত 'চলে' মধ্যবিত্ত 'চালে' নিম্নবিত্ত ' চোলে বলছেন। তবে মধ্য ও নিম্নবিত্তের কথ্যভাষায় তেমন বড় কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না কিন্তু এই দুই বিত্তই উচ্চবিত্তের তুলনায় একদম পৃথক কথ্যভাষা ব্যবহার করে থাকেন।

৩.৩ শিক্ষা ভেদে ভাষা পরিবর্তন—

শিক্ষা যে ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে তা আমরা অনেকেই জানি। একজন শিক্ষিত ও আর একজন স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর ব্যক্তির কথ্যভাষায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তেমনি একজন নিরক্ষর ও একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির ভাষার পার্থক্য খুব স্পষ্টভাবে আমাদের চোখে পড়ে। শিক্ষা একটি মানুষের মধ্যে চেতনা, জ্ঞান, রুচিবোধ, সংস্কৃতি, সচেতনতা ইত্যাদি বোধকে জাগ্রত ও বৃদ্ধি করে। তাই শিক্ষার তারতম্য হেতু মানুষের কথ্যভাষারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় শিক্ষার হার সবচেয়ে কম ৬০.১৩ শতাংশ। মোট জনসংখ্যা ৩,০০০,৮৪৯, মোট শিক্ষিত ১,৫২১,৯৩৩ জন। তাই শিক্ষিতের একটা বড় অংশ ও উচ্চ শিক্ষিত বাদে বাকী সবাই আঞ্চলিক (Regional) কথা বলেন ।

শিক্ষা ভেদে সামাজিক মানুষদের আমরা ৪টি ভাগে ভাগ করেছি। যথা—১. নিরক্ষর (Illiterate), ২. স্বল্পশিক্ষিত (Low-educated), ৩. শিক্ষিত (Educated), ৪. উচ্চ শিক্ষিত (High-educated)। এবার একটি নমুনা -এর মাধ্যমে ৪টি স্তরের মানুষের কথ্যভাষার পার্থক্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

৩.৩.১ নিরক্ষর (Illiterate)

বাও মি ক্যালকাত্তা যাবা চাছু। ক্যানে? এটি তো মোর নায়েক কুনো কাইম্ই নিছে। ঠিকে ছে।

৩.৩.২ স্বল্প-শিক্ষিত (Low-educated)

বা হামি কলকাতা যাবা চাহাছু। কেনে? এইঠিতো হামার লায়েক কোনো কাম্ই নি ছে। ঠিখ্ ছে।

৩.৩.৩ শিক্ষিত (Educated)

বাবা আমি কোলকাতা যেতে চাই। কেন? এখানে তো আমার উপযুক্ত কোনও কাজই নেই। ঠিক আছে।

৩.৩.৪ উচ্চশিক্ষিত (High-educated)

ড্যাড আমি ক্যালকাটা যেতে চাইছি। হোয়াই? এখানে তো আমার উপযুক্ত কোনও জব-ই নেই। ওকে।

উক্ত কথোপকথনটি পিতা ও পুত্রের। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে শিক্ষিত ও উচ্চ-শিক্ষিত মানুষেরা মান্যচলিত ও মান্যচলিতের সঙ্গে ইংরেজী মিশিয়ে কথা বলছেন। আর অন্যদিকে স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষেরা আঞ্চলিক ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে হিন্দি ও আরবী মিশিয়ে মিশ্র ভাষায় কথা বলছেন। শিক্ষার ভেদে ৪টি স্তরের মানুষের ভাষা প্রত্যেকের থেকে আলাদা। 'বাবা'কে নিরক্ষরেরা 'বাও' স্বল্পশিক্ষিতেরা 'বা' শিক্ষিতেরা 'বাবা' আর উচ্চশিক্ষিতেরা 'ড্যাড' বলছে। একই রকমভাবে 'আমি' কে 'মি' ও 'হামি', 'কলকাতা' কে 'ক্যালকাত্তা', 'কলকাতা' ও 'ক্যালকাটা', যেতে > যাবা, 'চাই'কে 'চাছু' 'চাহাছু' ও 'চাইছি', ' কেন' কে 'ক্যানে', ' কেনে', ' কেন'ও ' হোয়াই', 'এখানে'কে 'এটি'ও 'এইটি', 'আমার'কে 'মোর' 'হামার', 'উপযুক্ত'কে 'নায়েক' ও 'লায়েক', ' কোনও' কে 'কুনো' ও ' কোনো', 'কাজ'কে 'কাইজ', 'কাম্' ও 'জব', 'ঠিক আছে' কে 'ঠিকে ছে', 'ঠিক্ ছে' ও 'ওকে' বলছে। স্তরভেদে প্রায় প্রতিটি শব্দই পাল্টে যাচ্ছে। তাই শিক্ষার পৃথকতায় ভাষার পৃথকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৪. লিঙ্গভেদে ভাষা পরিবর্তন[১২]—

চলিত বাংলার ন্যায় আলোচ্য কথ্যভাষাতেও পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ—এই তিন প্রকার লিঙ্গের ব্যবহার রয়েছে। তবে ভাষার আলোচনায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। লিঙ্গভেদে ভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৪.১ নারীর ভাষা[১৩]

একই ভাষায় কথা বললেও নারীও পুরুষের ভাষা আলাদা। প্রথমত বলার ধরণে, দ্বিতীয়ত ভাবনার তারতম্যে, তৃতীয়ত সামাজিক অবস্থানের কারণে নারীর ভাষা পুরুষের ভাষা থেকে কিছুটা আলাদা। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানীরা সমাজের রক্ষণশীলতাকে নারীর ভাষা

বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। নারীর কথা বলার মধ্যে রয়েছে তাদের সহজাত মমত্ববোধ ও ভালোবাসার প্রতিফলন। নারীদের ক্ষেত্রে সমাজ যে বাধা-নিষেধ, নিয়ম-কানুন সৃষ্টি করেছে তার ফলে নারীর মনে সংকোচ ও ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। যা তাদের মুখের ভাষাকেও প্রভাবিত করেছে।

৪.১.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য[১৪]—

অ > আ = কলাই > কালাই, অমাবস্যা > আমাবস্যা

অ > এ = তবে > তেবে, হবে > হোবে > হেবে

আ > অ = পান্‌তা > পন্‌তা, মায়া > ময়া

ই > এ = বিবাহিত > বেহাতি, কিনারা > কেনারা

ন > ল = নীল > লীল, নাক > লাক

র > অ = রান্ধন > আন্ধন, রাক্ষস > আইক্ষস

ল > ন = লাল> নাল, লতা > নতা

যুক্তাক্ষর ভেঙ্গে স্বরধ্বনির আগম—

কৃপণ > কির্‌প্‌ন, প্রভাত > পরভাত

শ্লোক > শিলোক, ব্লাউজ > বিলাউজ

গ্লাস > গিলাশ, প্লেট > পিলেট

বর্ণদ্বিত—

শুক্র > শুক্কুর, প্রণাম > পোন্নাম

পুরানা > পুন্না, ঘৃণা > ঘিন্না

করলা > কোল্লা, চোপা > চোপ্পা (মুখ)

নাসিক্যীভবন—

আচমকা > আঁচ্‌কা, নিদ্রা > নিন্‌

আঁধার > আন্‌ধার > আন্‌হার, ইঁদার > ইনদার

ওড়না > ওড়নি > ওন্‌নি

স্বতোনাসিক্যীভবন—

আখা > আঁখা (উনুন), মাজা > মান্‌জা

মুজা > মুন্‌জা, ছায়া > ছেঁয়া বা ছাঁইয়া

সূচ > সুঁই, পুতুল > পুঁথ্‌লা

৪.১.২ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য[১৫]—

উপসর্গ[১৬]—

বেইহা - বেহায়া

আ - কুয়ারা - অবিবাহিত

বে-শরম - নির্লজ্জ

নি-খাক্কী - খাওয়ার প্রতি আগ্রহ নেই যার

বে-ঘিন্না - খুব ঘৃণা

হা-বাইতা - হাভাবে

অনুসর্গ—

নারীর কথ্যভাষায় কিছু নতুন অনুসর্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যথা—দিয়া (অর্থ - তারপর), ল্যগা (অর্থ - জন্য), লিয়া (অর্থ - নিয়ে), বাদে (অর্থ - জন্য), বাক্যে প্রয়োগ - ভাত পাকানু, দিয়া কাপড়া ধোনু (অর্থ - ভাত রাধলাম, তারপর কাপড় ধুলাম)

সর্বনাম পদ—

মুই/হামি, হামরা, হামাঘের/হামারঘে, তোরঘে/ তোঘরে ইত্যাদি সর্বনাম পদ ব্যবহার করে থাকেন। তবে যাদের নাম তারা মুখে উচ্চারণ বা বলতে চান না বা জানেন না, সেসব ক্ষেত্রে তারা ফল্‌না, অমুক, তমুক ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন।

৪.১.৩ বাক্য ব্যবহার[১৭]—

ক. বাক্য ব্যবহারে দেখা যায় শব্দের সঙ্গে বাহুল্য একটি ধ্বনি জুড়ে দিয়ে মহিলারা উচ্চারণ করে থাকেন। যেমন—

১. চুলে খুবে আঝোট নাগিছে (আ + জট)

২. কাম করতুক তো বালো ল্যাগতক্‌ (লাগত + ক)

৩. মুখে যা অ্যালো বেঘিন্না করে কোহলে (বে + ঘৃণা)

খ. নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কথিত বাক্য সম্পূর্ণ করেন না। সেক্ষেত্রে তারা প্রবাদ-প্রবচনের আশ্রয়ে কথার সারমর্মটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যেমন—

১. ছাঁই ফেলবা ভাঙ্গা কুলা এখন হামাকেই দরকার।

২. তোর ছাই দড়ি পাকা কথা মুই নি শুনিম্ । (ঘোর প্যাচ কথা)

৩. হামার কি ড্যাল গলেছে যে তোর বাড়ি যাম্। (তুচ্ছার্থে প্রয়োগ)

গ. নারীরা বাক্যের সঙ্গে একটি যোজিত প্রশ্ন (tag question) জুড়ে দেয়। এর পেছনে নারী মানসিকতা বড় ভূমিকা পালন করে। যেমন—

১. আজ হামাক তোর সাথে ঘুরাবা লিয়ে যাবি। যাবি তো?

২. তুমি তো আজ জল্‌দি আসবে। ত্যাই না?

ঘ. মহিলারা অনেক ক্ষেত্রেই সোজাসুজি ভাবে না বলে বাক্যকে ঘুরিয়ে অন্যভাবে নম্রস্বরে বলে থাকেন। নারীর স্বভাবসিদ্ধ মাতৃত্বতা, নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও কোমল মনোভাব তাদের কথায় ও বলার ভঙ্গিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন—

তুমি আসপার সুম্যা একটা বিরিয়ানি লিয়া আসপাতো বহৎ দিন সে হামার খাবা মন চাহাছিল্। (তুমি আসার সময়ে একটা বিরিয়ানি নিয়ে এসোতো অনেক দিন থেকে আমার খেতে ইচ্ছা করছিল)

৪.১.৪ শব্দভাণ্ডার[১৮]—

প্রয়োগমূলক শব্দ—

নারীরা প্রভৃতি প্রয়োগ মূলক শব্দ ব্যবহার করে থাকে। যেমন—আহারে (দুঃখ প্রকাশ), ই-আল্লা/হায় ভগবান, এচ্ছি (ছি ছি), নাখো (নাকো), ছিক্কো (ঐ), ওমা ইত্যাদি।

আশির্বাদ সূচক শব্দ—

আশুরবাদ (আশীর্বাদ), দণ্ডপোত (প্রণাম), অত্ত বড়ো হও, দুধে ভাতে থাকো, স্বামী সোহাগী হও, ফুলো - ফলো, মায়ের কৃপায় ভালো থাকো ইত্যাদি।

গালাগালের শব্দ—

ভাতার সোহাগী, চোপা বাজানী (অর্থ - ঝগরাটে), গতরখাকী/শরীল সোহাগী (অর্থ - শরীরকে আরাম দেয় যে), ঝাঁট/কালী (অর্থ - চুল ঝাটার মতো খাড়া), আলু -খাকি (অর্থ - বোকা), বামনী মাগী (অর্থ - শুচি বায়ু গ্রস্থ), থুত্‌নী-পাকা (অর্থ - বেশী বক্‌বক্ করা) ইত্যাদ।

ভাবদ্যোতক শব্দ[১৯]**—**

নারী-পুরুষ উভয়ে গে, গো, রে, হে, জি, আজ্ঞে ইত্যাদি দ্বারা সম্বোধন করে থাকে। কিন্তু নারীরা বিশেষভাবে আলো, কিলো, শোন্ লো, কণ্ঠে গেলি লো, কালা নাকিলা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। স্বামীকে সম্বোধন করেন 'অমুকের বাবা' বলে। যেমন—'ও বিল্টুর বাবা'। তবে বর্তমান নারীরা স্বামীকে 'ওগো', 'হ্যাঁগো', 'শুনছো' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে থাকেন।

৪.১.৫ শব্দার্থতত্ত্ব—

সুভাষণ রীতি[২০]**—**

খারাপটাকে আড়াল করে ভালোর মোড়কে বলাই হচ্ছে সুভাষণ রীতি। সামাজিক কুসংস্কার থেকে নারীর মনে যে ভয় ও দুর্ভাবনার উদয় হয় তা থেকেই জন্ম হয় নিষিদ্ধ শব্দের। যেমন—'নেই' বলা মানে সংসারে দারিদ্রতাকে আমন্ত্রণ করা। এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে সুভাষণ রীতির। যেমন—চাল বা ভাত না থাকলে বলা হয় 'চাল বাড়ন্ত' বা 'ভাত বাড়ন্ত'। ভিখারীকে বিদায় করতে চাইলে বলে 'মাপ করবেন' বা 'ফিরতা হপে' (ফিরে আসুন)। তেমনি কিছু নাম যা রাত্রে বলতে নেই, অথচ বোঝাবার জন্য অন্য শব্দের আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন রং (হলুদ), লতা (সাপ), চুন (দই), রাতচরা (বাদুর), বালি (সর্ষে), বুড়িমা (কলেরা), বড়মা (বসন্ত), মা (গুটি বসন্ত) ইত্যাদি।

৪.২ পুরুষের ভাষা—

অন্যান্য অধ্যায়ে যে ভাষা তুলে ধরা হয়েছে সবই পুরুষের ভাষা। তাই আলাদা আলোচনা করা হল না ।

৫. ধর্মভেদে ভাষা পরিবর্তন[২১]**—**

উত্তর দিনাজপুর জেলার সমাজ মূলতঃ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। তবে অল্প পরিমাণ খ্রীষ্টান, জৈন, শিখ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। জৈন, শিখ ও বৌদ্ধের জনসংখ্যা খুবই সামান্য পরিমাণ। এই জেলার হিন্দু সম্প্রদায় ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছেন ফলে শতকরা ১০০ ভাগ খ্রীষ্টানই সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে থাকেন। জেলার বৃহত্তর হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য বিস্তর না হলেও চোখে পড়ার মতো।

ধর্মগত ভাবে জেলার জনসংখ্যা (২০১১)[২২]—

হিন্দু	মুসলিম	খ্রীষ্টান	জৈন	শিখ	বৌদ্ধ	অন্যান্য
১৫৪২০০১	১৪৩৫০৩৫	১৪৪৭৩	১৫৪৮	৪৭৮	৬৬৯	৬৬৪৫
						মোট - ৩০০০৮৪৯ জন

ধর্মভেদে ভাষা পরিবর্তনের আলোচনায় আমরা শুধুমাত্র হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কেই রাখব। মূলত ৫টি কারণের ওপর ভিত্তি করে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাষা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—১. ধর্মীয় শব্দ ২. পারিবারিক সম্পর্ক নির্দেশক শব্দ ৩. নামকরণ ৪. সম্বোধন, প্রত্যুত্তর, অভিবাদন সূচক শব্দ ৫. নৈকট্যসূচক বিভক্তি।

৫.১ ধর্মীয় শব্দ[২৩]

ধর্মীয় শব্দ ব্যবহারের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

মুসলিম ব্যবহৃত	হিন্দু ব্যবহৃত	অর্থ
আল্লাহ্/খোদা	ঈশ্বর/ভগবান	স্রষ্টা
নামাজ	উপাসনা/প্রার্থনা	প্রার্থনা
বেহেশ্‌ত্	স্বর্গ	পরকালের সুখের আবাস
দোজখ	নরক	পরকালের শাস্তির আবাস
ফেরেশ্‌তা	দেবতা	স্রষ্টার অশরীরি প্রতিনিধি
রোজা	উপবাস	খাদ্য গ্রহণে বিরতি
হজ	তীর্থযাত্রা	পূর্ণার্থে যাত্রা
কলেমা	মন্ত্র	পবিত্র শব্দে বা বাক্যে স্রষ্টার প্রার্থনা
শিন্নি	প্রসাদ	স্রষ্টাকে নিবেদিত ভোজ্য সামগ্রী
জাল্‌সা	কীর্ত্তন	স্রষ্টার গুণ বর্ণন

৫.২ পারিবারিক সম্পর্ক নির্দেশক শব্দ[২৪]

আত্মীয়তাসূচক বা স্বজনসূচক শব্দের ব্যবহার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের পার্থক্য লক্ষিত হয়।

মুসলিম ব্যবহৃত	হিন্দু ব্যবহৃত	অর্থ
আব্বা	বাবা	পিতা
আম্মা	মা	মাতা
চাচা	কাকা	পিতার ভাই
চাচি	কাকী	পিতার ভাইয়ের স্ত্রী
খালা	মাসী	মাতার বোন
খালু	মেশোমশাই	মাতার বোনের স্বামী
ফুফু	পিসি	পিতার বোন
ফুফা	পিশেমশাই	পিতার বোনের স্বামী
আপা/বুবু	দিদি	নিজের বড় বোন
নানা	দাদু	মায়ের বাবা
নানি	দিদিমা	মায়ের মা
ভাবি	বৌদি	বড় ভাইয়ের বৌ

৫.৩ নামকরণ[২৫]—

ব্যক্তি বিশেষে নামকরণের ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য চোখে পড়ে। এই পার্থক্য ধর্ম ভিত্তিক নামকরণের ক্ষেত্রে। হিন্দু নাম মূলত সংস্কৃত উৎসজাত, অপরপক্ষে মুসলিম নাম আরবি-ফারসি প্রভাবিত। সংস্কৃত প্রভাবিত হিন্দু নামের আগে 'শ্রী' থাকে যেমন— শ্রী রামকৃষ্ণ মল্লিক। আবার আরবি-ফারসি প্রভাবিত মুসলমান নামের আগে ' মোহাম্মদ' বসে যেমন— মোহাম্মদ আখতাব শেখ। হিন্দুদের নামের শেসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণ-সূচক পদবী থাকে। মুসলিমদের নামের শেষে অথবা প্রথমে কখনো কখনো খান, সৈয়দ ইত্যাদি দেখা যায়। কিছু কিছু পদবি যা এককালে ছিল 'উপাধি' বা 'title' তা উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ই ব্যবহার করে থাকে যেমন— চৌধুরী, সরকার, নস্কর, লস্কর ইত্যাদি।

৫.৪ সম্বোধন, প্রত্যুত্তর, অভিবাদন সূচক শব্দ[২৬]—

সম্বোধন সূচক শব্দ, প্রত্যুত্তর মূলক শব্দ, অভিবাদন সূচক শব্দ ব্যবহারে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সম্বোধন সূচক শব্দের ক্ষেত্রে—

সম্ভাষক	সম্ভাষিত	রূপমূল	উদাহরণ
হিন্দু ও মুসলিম	হিন্দু	বাবু	পরেশ বাবু
হিন্দু ও মুসলিম	মুসলিম	সাব/সাহেব মিয়া	আব্দুল মিয়া

প্রত্যুত্তরমূলক শব্দের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যুত্তরমূলক দু'ধরণের শব্দ পাওয়া যায়। যথা—কি এবং জি (Zi)। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে সম্ভাষক কম বয়সী বা কম সম্মানীয় হলে সম্ভাষিত প্রত্যুত্তরে 'কি' ব্যবহার করে থাকে। সম্ভাষক যদি সম্মানীয় ব্যক্তি হন, তিনি হিন্দু হলে প্রত্যুত্তরে সম্ভাষিত হিন্দু 'আজ্ঞে' ব্যবহার করবে, আর মুসলিম হলে প্রত্যুত্তরে সম্ভাষিত মুসলিম 'জি' (Zi) ব্যবহার করবে।

অভিবাদনসূচক শব্দে ও দুই সম্প্রদায়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। হিন্দুরা হিন্দুদের মধ্যে 'নমস্কার' ব্যবহার করে। অপরপক্ষে মুসলিমরা মুসলিমদের মধ্যে 'আস্‌সালাম আলাইকুম' ব্যবহার করে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই 'আদাব' শব্দটি ব্যবহার করে। তবে বর্তমান হিন্দুদের মধ্যে 'আদাব' শব্দটি ব্যবহার কম লক্ষ্য করা গেছে।

৫.৫ নৈকট্যসূচক বিভক্তি[২৭]**—**

আদর ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাংলায় কিছু নৈকট্যসূচক বিভক্তি আছে। নৈকট্যসূচক বিভক্তি দুই সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে থাকে। হিন্দু ব্যবহৃত বিভক্তি সমূহ হল মণি (যেমন—পিসিমণি), বাবু (যেমন—দাদাবাবু) ইত্যাদি। মুসলিম ব্যবহৃত বিভক্তি সমূহ হল জি (যেমন—আব্বাজি), জান (যেমন—আব্বাজান) ইত্যাদি।

কথ্যভাষায় বাক্য ব্যবহারে দুই সম্প্রদায়ের ভিন্নতা—

কথ্যভাষায় বাক্য ব্যবহারে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিন্নতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। একটি কথোপকথনের মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের বাক্ ব্যবহারের ভিন্নতা তুলে ধরা হল—

মুসলিম সম্প্রদায়—

(১ম ব্যক্তি - মুসলিম, লিঙ্গ - পুরুষ, বয়স - ৪০)

(২য় ব্যক্তি - মুসলিম, লিঙ্গ - পুরুষ, বয়স - ২৫)

১ম ব্যক্তি - আস্‌সালাম আলাইকুম, মোশারফ মিয়া।

২য় ব্যক্তি - আলাইকুমাস্‌সালাম্‌, বড় ভাই জান।

১ম ব্যক্তি - ক্যানম্‌ ছিস?

২য় ব্যক্তি - তমাদের দুয়ায় ভালো আছি।

১ম ব্যক্তি - ফুফু-ফুফার তবিয়ত্‌ ক্যানম্‌ ছে?

২য় ব্যক্তি - আল্লার দুয়ায় ভালো ছেন।

১ম ব্যক্তি - শুনলাম তুই নাকি শাদি করবো, দুলা বন্‌বো?

২য় ব্যক্তি - জ্বি, দাওয়াত ভেজবো, আস্‌পা হোবে।

১ম ব্যক্তি - খোদা হাফেজ

২য় ব্যক্তি - খুদা হাফেজ

হিন্দু সম্প্রদায়—

(১ম ব্যক্তি - হিন্দু, লিঙ্গ - পুরুষ, বয়স - ৪০)

(২য় ব্যক্তি - হিন্দু, লিঙ্গ - পুরুষ, বয়স - ২৫)

১ম ব্যক্তি - নমস্কার, শিব নারায়ণ বাবু।

২য় ব্যক্তি - নমস্কার, দাদাবাবু।

১ম ব্যক্তি -ক্যানম্‌ ছিস?

২য় ব্যক্তি - তমাদের আশিব্‌বাদে ভালো আছি।

১ম ব্যক্তি - পিসি-পিসার শরিল্‌ ক্যানম্‌ ছে;

২য় ব্যক্তি - ভগবানের আশিব্‌বাদে ভালো ছেন।

১ম ব্যক্তি - শুনলাম তুই নাকি বিয়া কববো, বর হবো?

১ম ব্যক্তি - আজ্ঞে, নেমন্তন পাঠাম্‌, আস্‌পা হোবে।

১ম ব্যক্তি - অ্যাইসো।

২য় ব্যক্তি - অ্যাইসেন।

৬. পরিবেশ-পরিস্থিতিভেদে ভাষা পরিবর্তন—

বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানুষের ভাষার পরিবর্তন হয়ে থাকে। সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি মানুষের ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন মানসিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন মানসিক পরিবেশ-পরিস্থিতি যেমন—আনন্দ, বিষাদ, অনুতাপ, রাগ, আশ্চর্য, ঝগড়া, শোক, বিরক্তি ইত্যাদির তারতম্যে ভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এই পরিবর্তন তুলে ধরা হল—

৬.১ আনন্দ—

কি মজা, ইমতিহান্ খতম্, কাল সে ইস্কুল যাবা নি হোবে। (কি মজা, পরীক্ষা শেষ, কাল থেকে স্কুল যেতে হবে না)

উক্ত বাক্যটি একজন স্কুল পড়ুয়া বলেছে। বাক্যটির মধ্যদিয়ে বক্তার মনের আনন্দ ধরা পড়েছে। 'কি মজা' শব্দদ্বয়ের দ্বারা বক্তা মনের আনন্দকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। আলোচ্য বাক্যটি শোক, রাগ, অনুতাপ ইত্যাদি অন্য পরিবেশ ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। বাক্যটি আনন্দের পরিস্থিতিকেই ব্যক্ত করে।

৬.২ বিষাদ—

উফ্, মি আর একেলা ই জীবনে বাঁচ্বা নি চাহাছু। (উফ্, আমি আর এক্লা এই জীবনে বাঁচতে চাই না)

উক্তিটি একজন বয়স্ক ব্যক্তির। পরিবার পরিজনহীন ব্যক্তিটি নিতান্ত একলা জীবনে আর বেঁচে থাকতে চাইছেন না। বাক্যটির মধ্যে একটি বিষাদের সুর ধরা পড়েছে। 'উফ্' অব্যয়ের দ্বারা বক্তার বিষাদ ভাবকে সহজেই অনুমান করা যায়। বাক্যটি একটি নির্দিষ্ট মানসিক পরিবেশ-পরিস্থিতিকেই তুলে ধরে।

৬.৩ অনুতাপ—

ইস্, পহেলে জান্লে মি তোক মালখান দিলে ত্যান্। (ইস্, প্রথমে জানলে আমি তোকে জিনিসটা দিয়ে দিতাম)

বাক্যটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বক্তার অনুতাপ ধরা পড়েছে। 'ইস্' অব্যয় দ্বারা এই অনুতাপ আরও সুস্পষ্টভাবে শ্রোতার কাছে ধরা পড়ে। আনন্দ, শোক, রাগ ইত্যাদি অন্য

পরিবেশে এই বাক্যটির প্রয়োগ বেমানান। তাই অনুতাপেই আমরা সাধারণত 'ইস্' ব্যবহার করি।

৬.৪ রাগ—

মোর সাথ বাত্ নি কহাবো, তি মোর নজর সে দুর হোইংজা। (আমার সাথে কথা বলবি না, তুই আমার নজর থেকে দূর হয়ে যা)

বাক্যটির মধ্যদিয়ে আমরা বক্তার এক বিশেষ মানসিক পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা অনুমান করতে পারি। তা হল রাগ। রাগেই একমাত্র মানুষের মুখে আমরা এই রকম ভাষা শুনতে পাই। অন্য কোনো পরিস্থিতিতে এ ভাষার প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই না।

৬.৫ আশ্চর্য—

বাপ্রে, সাদেক মিয়া আভি অ্যাত্লা বড়া আদ্মি বনে গেল্! (বাপরে, সাদেক মিয়া এমন এত বড় মানুষ হয়ে গেল!)

বাক্যটির মধ্যদিয়ে বক্তার আশ্চর্য ভাব ধরা পড়েছে। 'বাপ্রে' অব্যয়ের দ্বারা বক্তা বাক্যের প্রথমেই তার মনের আশ্চর্য ভাবকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই 'বাপ্রে' অব্যয়টি শোক, বিরক্তি, আনন্দ বিষাদ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা অসম্ভব। তাই বিশেষ আশ্চর্য ভাবকে ফুটিয়ে তুলতেই 'বাপ্রে' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

৬.৬ ঝগড়া/বিবাদ—

চোপ্ গতরখাকি, হামার সাথ জাদা চোপা লারিস না। (চুপ গতরখাকি, আমার সাথে বেশী কথা বলিস না)

উক্ত বাক্যটি ঝগড়া বা বিবাদের ভাষার নমুনা। 'গতরখাকি', ' চোপালারা' গালাগালের শব্দ। এই সকল শব্দ সাধারণত ঝগড়ায় সময় নারীর মুখে শোনা যায়। অন্য কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে গালাগালের শব্দ ব্যবহার (slang) করা হয় না। আর এই গালাগাল সমাজ সম্পৃক্ত। তাই বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই এই শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

৬.৭ শোক—

হায় হায়, বাপ-মা মরা বেটিটার এখুন কি হোবে? কুন্টি যাবে? (হায় হায়, বাপ-মা মরা মেয়েটার এখন কি হবে? কোথায় যাবে?)

বাক্যটি শুনলেই বোঝা যায় বাক্যটির বক্তা শোক প্রকাশ করছে। বাক্যটি যে আনন্দ,

রাগ, আশ্চর্য, ঝগড়া ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করছে না তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। 'হায় হায়' শব্দটি শোক জ্ঞাপক অব্যয় পদ। তাই শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বাক্যটি শোকব্যঞ্জক। আর 'হায় হায়' অব্যয়টি সমাজই বক্তাকে শিখিয়ে দেয়। এখানেই ভাষার ব্যবহারে সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৮ বিরক্তি—

ধ্যাৎ, কাম্‌খান বিগ্‌রে গেল্। (ধেৎ, কাজটা নষ্ট হয়ে গেল)

বাক্যটির মধ্যদিয়ে বক্তার বিরক্তিভাব ফুটে উঠেছে। 'ধ্যাৎ' অব্যয় দ্বারা বক্তা বিরক্তি ভাবকে ব্যক্ত করছে। আনন্দ, শোক, আশ্চর্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ধ্যাৎ' শব্দটির প্রয়োগ হয় না, তা সমাজ শিখিয়ে দেয়। এখানেই ভাষার ওপর সমাজের প্রভাব।

৭. অন্যান্য সূত্রে ভাষা পরিবর্তন—

বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষার অন্যান্য সূত্রে ভাষা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৩টি সূত্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন—১. শ্রোতাভেদে ২. উপলক্ষ্য ভেদে ৩. কৃত্রিম ভাষাভেদে। এই সূত্রগুলি নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৭.১ শ্রোতা ভেদে ভাষা পরিবর্তন[২৮]**—**

বক্তা ভেদে যেমন ভাষা পরিবর্তন হয়, তেমনি শ্রোতা ভেদেও ভাষা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শ্রোতার বয়স কত? তার কী পেশা? সে পুরুষ না নারী? তার কী জাতি? সে হিন্দু না মুসলিম? তার অর্থনৈতিক কী অবস্থা অর্থাৎ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত না নিম্নবিত্ত? সে নিরক্ষর-স্বল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত নাকি উচ্চশিক্ষিত ইত্যাদি তারতম্যে শ্রোতা ভেদে ভাষা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় আমরা একটি তিরস্কার বাক্য প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি—'কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানো না? এখানেই ভাষার ওপর শ্রোতার সামাজিক ভূমিকার প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি।

আমরা গুরুজনদের সাথেএকরকম কথা বলি, বন্ধুদের সঙ্গে আরেকরকম কথা বলি, শিক্ষকের সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলি, দোকানীর সঙ্গে একরকম কথা বলি, রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আরেক রকম, অপরিচিতের সঙ্গে আরেক ভাবে, উচ্চ পদাধিকারীকের সঙ্গে আরেক ভাবে, অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আরেক ভাবে, প্রেমাস্পদের সঙ্গে অন্যভাবে, ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে আরেকরকম ভাবে কথা বলি। আমরা বাবা-মায়ের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি বাস

কণ্ডাক্টারের সাথে সেভাবে কথা বলি না। আবার পুলিশের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি সব্জি বিক্রেতার সঙ্গে সেভাবে কথা বলি না। অর্থাৎ শ্রোতা অনুযায়ী ভাষার বিশেষ রীতি বদলে ফেলি।

শ্রোতা ভেদে একজন বক্তার কিরূপ ভাষা পরিবর্তন হয় তা বাক্যের মাধ্যমে স্পষ্ট রূপে তুলে ধরা হল।

বন্ধু - কিরে আজ বিকালে খেল্‌বা যাবা হোবে তো?

শিক্ষক - স্যার, টিপেনের পর কি ফের কেলাশ হোবে?

দোকানী - দাদা, ফট্ করি জিনিসগালা দিয়্যা দে।

বাচ্চা - ওলে বাবা লে, কি দুদ্‌তামি করে।

বাস কণ্ডাকটার - বোলো তো, ক্যাত্‌লা হোচে?

পুলিশ - কি হোচে সাব্? মুই তো কুছুই বুঝবা নি পাহাছু।

উচ্চ পদাধিকারীক - নমস্কার স্যার, হামি বিপদে ছি। একখান্ কাম করবা হোবে।

রিক্সাওয়ালা - ও ভেই, কলেজ মোর যাবা?

৭.২ উপলক্ষ্য ভেদে ভাষা পরিবর্তন[২৯]—

ভাষীর বা বক্তার প্রতিটি কথাবার্তার মধ্যদিয়ে একটি বিশেষ পরিস্থিতিগত প্রতিবেশ উঠে আসে। ভাষী পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের বক্তব্যকে গুছিয়ে নেয়। তাই ভাষীর বক্তব্য পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে ওঠে ও শ্রোতা সেই পরিস্থিতি বা উপলক্ষ্য বুঝতে সমক্ষ হয়। তাই প্রতিটি ভাষীর বক্তব্য থেকেই আমরা তার উপলক্ষ্য বা পরিস্থিতি বুঝে নিতে পারি। সুতরাং উপলক্ষ্য ভেদে যে ভাষার পরিবর্তন হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্লাসে পড়ানোর এক ধরণের ভাষা, আড্ডার এক ধরণের ভাষা, ঝগড়ার আর-এক ধরণের ভাষা, সভা সমিতি-ভাষণের আর-একধরণের ভাষা, আইনের ব্যাখ্যায় আর এক ধরণের ভাষা, বিজ্ঞানের আর-এক ধরণের ভাষা, আদরের আরেক ধরণের ভাষা, সাংবাদিকতায় আরেক ধরণের ভাষা, শাসনের এক-ধরণের ভাষা। সিচুয়েশন বা উপলক্ষ্য অনুযায়ী ভাষার পরিবর্তন হয় তাকে রেজিস্টার (Register) বলা হয়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

১. সবগোই মন দিয়্যা শুনেক্, আজ হামরা পড়িম্ মুগল শাসন। ছাত্র-ছাত্রী বাত্ নি

করবো। (উপলক্ষ) - ক্লাসে পড়ানো)

২. বন্ধু সব, হামরা সভ্যাই এক জুট হয়্যে এ অল্ল্যায়ের পোতিবাদে সামিল হবো। (উপলক্ষ্য - সভায় ভাষণ)

৩. চুপ কর চোপা বাজানী, ঝাটা কালি, জাদা চোপা লারিস না। (উপলক্ষ্য - ঝগড়া/বিবাদ)

৪. অফার, অফার, অফার। সীমিত সুযোগ। আর মাত্র তিন দিন। এখুনি ঘরে লিয়ে যান ১০০ টাকার সিল্ক শাড়ি। (উপলক্ষ্য - বিজ্ঞাপন)

৫. হাম্‌রা আভি ছি উ জায়গা, যাহা আজ শুভা এক বাচ্চার এক্‌সিডেন্‌ হোইংছিল। হামি পারভেজ, কেমেরায় ইকবাল তামিম। (উপলক্ষ্য - সাংবাদিকতা)

৬. তি হ্যতাক্‌ সে আভি নিক্‌লে যা। ফের জুদি মুই শুন্‌লো তি জুয়া খেলাছিস তো দেখিলিস মি তোর কি করু। (উপলক্ষ - শাসন করা)

৭. এতদ্বারা সবগোই জানান্‌ যাছে যে, অদ্য তিন ঘটিকায় ইস্কুল ময়দানত্‌ এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হছে। সভ্যাইকে আসার অনুরোধ করা যাছে। (উপলক্ষ্য - বিজ্ঞপ্তি)

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি থেকে খুব সহজেই উপলক্ষ্যগুলি অনুমান করা যায়। প্রতিটি উদাহরণে বিশেষ উপলক্ষ্য ভেদে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করতে পারি। এই বিভিন্ন শব্দের উপস্থিতি আমাদের উপলক্ষ্য চিনিয়ে দিতে বিশেষ সাহায্য করে। একটি সারণীর মাধ্যমে তা তুলে ধরছি।

উপলক্ষ্য	**শব্দ**
ক্লাস	শুনেক্‌, পড়িম্‌, মুগল, ছাত্র-ছাত্রী
সভায় ভাষণ	বন্ধু সব, এক জুট, পোতিবাদ, সামিল
ঝগড়া	চোপাবাজানী, ঝাটা কালি
বিজ্ঞাপন	অফার, সুযোগ সীমিত, মাত্র তিন দিন
সাংবাদিকতা	শুভা, বাচ্চা, এক্‌সিড্‌েন, কেমেরায়
শাসন	নিক্‌লে, জুদি মুই শুনলো, কি করু
বিজ্ঞপ্তি	এতদ্বারা, জানান্‌, আয়োজন, অনুরোধ

৭.৩ কৃত্রিমভাষা (গোপনভাষা) ভেদে ভাষা পরিবর্তন[৩০]—

সর্বসমক্ষে কিন্তু সবাইকে গোপন করে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের প্রয়োজনেই কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সঙ্কেত বা কোড ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য কথ্যভাষায় তেমনই একটি কৃত্রিম বা গোপন ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ১০-৩০ বছরের ছেলে- মেয়েদের মধ্যে এই গোপন ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা সর্বাধিক। ৩০ বছরের অধিক নারী-পুরুষেরা কৃত্রিম ভাষা প্রায় ব্যবহার করে না বললেই চলে। আলোচ্য কথ্য ভাষায় যে কৃত্রিম ভাষাটি ব্যবহার করা হয় তার নাম হল 'টিটা' ভাষা। 'টিটা' ভাষার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল—

উদাহরণ—

যিটখুনা শিটাশ ইটাপনা বিটহুক্ বিটহু নিটি বিটেটির সিটা মিটানবে ইটার বিটহুভি ইটাপনা শিটাশক্ শিটাশ নিটি মিটার সিটা মিটানবে তিটখুনা পিটরিবিটারের তিটারিক্কি হিটোইবে। (যখুনা শাশ আপনা বহুক্ বহু নি বেটির সা মানবে আর বহুভি আপনা শাশক্ শাশ নি মার সা মানবে তখুনা পরিবারের তারিক্কি হোইবে।)

ব্যবহার বিধি—

আলোচ্য কৃত্রিম ভাষায় প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণের পর 'ট' বর্ণটি যুক্ত হয়। শব্দের প্রথম বর্ণের সঙ্গে অবশ্যই 'ি' (ই) স্বরধ্বনির সাংকেতিক রূপ যুক্ত হয়। আর প্রথম বর্ণের সাথে যুক্ত স্বরধ্বনির সাংকেতিক রূপটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরের 'ট' বর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। শব্দ যদি এক অক্ষরের হয় তবে প্রথম অক্ষরের পরেই 'ট' বর্ণটি যুক্ত হবে। শব্দ যদি দুই অক্ষরের হয় তবে 'ট' দুই অক্ষরের মাঝে যুক্ত হবে। শব্দ যদি তিন অক্ষরের হয় তবে 'ট' শুধু প্রথম অক্ষরের পর যুক্ত হয়। শব্দ যদি চার অক্ষরের হয় তবে প্রতি দুই অক্ষরের মাঝে একটি করে 'ট' যুক্ত হয়। শব্দ যদি পাঁচ অক্ষরের হয় তাহলে প্রথম দুই অক্ষরের মাঝে আর পরের দুই অক্ষরের মাঝে 'ট' বর্ণ যুক্ত হয়। শব্দ যদি ছয় অক্ষরের হয় তবে প্রতি দুই অক্ষরের মাঝে একটি করে 'ট' বর্ণ যুক্ত হতে দেখা দেয়। এর পাশাপাশি চলতে থাকে অন্যান্য বিধিগুলো।

তথ্যসূত্র:

১. মৃণাল নাথ, ভাষা ও সমাজ, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ১০৮-১১৮।

২. Charuchandra Syanyal, The Rajbanshis of North Bengal, 1965, First Edition, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, p. 85-115.

৩. উদয়কুমার চক্রবর্তী, নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২০০৬, প্রথম প্রকাশ, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স, কলকাতা, পৃ. ২৫-৩০।

৪. মীর রেজাউল করিম, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৩-৫৯।

৫. তদেব, পৃ. ৩২-৩৪।

৬. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী, পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা, ১৩৯৫, প্রথম প্রকাশ, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ. ২৫৫-২৬১।

৭. মৃণাল নাথ, ভাষা ও সমাজ, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ৮৮-৯৫।

৮. মনসুর মুসা, ভাষা পরিকল্পনার সমাজ ভাষাতত্ত্ব, বাংলাদেশ, পৃ. ৩৭।

৯. রাজীব হুমায়ুণ, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, ২০০১, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৩-৪০।

১০. উদয়কুমার চক্রবর্তী, নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২০০৬, প্রথম প্রকাশ, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স, কলকাতা, পৃ. ১৬৬-১৯২।

১১. রাজীব হুমায়ুন, সমাজভাষাবিজ্ঞান, ২০০১, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৩-৪০।

১২. মৃণাল নাথ, ভাষা ও সমাজ, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ৯৬-১০৭।

১৩. সুকুমার সেন, 'বাঙলায় নারীর ভাষা', হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০১, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৮৮-৫৮৯।

১৪. শর্মিলা বসুদত্ত, বাংলায় মেয়েদের ভাষা, ২০১৪, তৃতীয় প্রকাশ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩৩-৪৭।

১৫. রাজীব হুমায়ুন, সমাজভাষাবিজ্ঞান, ২০০১, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪৮-৫০।

১৬. নির্মল দাশ, উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ, ২০০১, দ্বিতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৩৬।

১৭. শর্মিলা বসুদত্ত, বাংলায় মেয়েদের ভাষা, ২০১৪, তৃতীয় প্রকাশ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৮৪-১০২।

১৮. তদেব, পৃ. ৪৮-৮৩।

১৯. সুকুমার সেন, 'বাঙলায় নারীর ভাষা', হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০১, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৯৪-৫৯৫।

২০. তদেব, পৃ. ৫৯৫।

২১. রাজীব হুমায়ুন, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, ২০০১, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৬৯-৭৭।

২২. Census of India - 2011, Provisional population totals, Ministry of Home Affairs, Government of India.

২৩. মৃণাল নাথ, ভাষা ও সমাজ, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ১২৯।

২৪. রাজীব হুমায়ুন, সমাজভাষাবিজ্ঞান, ২০০১, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৭০-৭১।

২৫. মৃণাল নাথ, ভাষা ও সমাজ, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ১৩০।

২৬. তদেব, পৃ. ১৩০-১৩১।

২৭. রাজীব হুমায়ুন, সমাজভাষাবিজ্ঞান, ২০০১, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৭২।

২৮. পবিত্র সরকার, ভাষা দেশ কাল, ১৪১২, প্রথম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

২৯. তদেব, পৃ. ১৫৬-১৫৮।

৩০. উদয়কুমার চক্রবর্তী, নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২০০৬, প্রথম প্রকাশ, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স, কলকাতা, পৃ. ৫১-৬৯।